জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়
তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

বাংলাদেশে ২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট বিক্ষোভ চলাকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়ন

UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER

জাতিসংঘ

মূল: ইংরেজি
১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন:

বাংলাদেশে ২০২৪ এর জুলাই-আগস্ট বিক্ষোভ চলাকালে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়ন

BANGLA NEWS 24 .com

I. মূল সারাংশ

বাংলাদেশে ব্যাপক বিক্ষোভের প্রেক্ষাপট ও তৎপরবর্তী পরিস্থিতিতে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়নের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের আমন্ত্রণে ওএইচসিএইচআর একটি স্বাধীন তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রম চালায়। সংগৃহীত সব তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং স্বাধীন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআরের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে যে, সাবেক সরকার এবং এর নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনী আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহিংস বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে পদ্ধতিগতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িয়ে পড়ে যার মধ্যে শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, হাজার হাজার বিক্ষোভকারীর ওপর জোরপূর্বক বলপ্রয়োগ, নির্বিচারে আটক ও নির্যাতনসহ অন্যান্য নিগ্রহের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এমনকি ওএইচসিএইচআর যৌক্তিক কারণে মনে করে যে, বিক্ষোভ ও ভিন্নমত দমনের কৌশল হিসেবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং উর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জ্ঞাতসারে, সমন্বয়ে এবং নির্দেশনায় চালানো হয়েছে। এসব গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি অপরাধ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও উদ্বেগজনক। তাই, কোন মাত্রার মানবতাবিরোধী অপরাধ ও নির্যাতন (স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে) ও দেশীয় আইনের অধীন গুরুতর অপরাধসমূহ সংঘটিত হয়েছে, তা মূল্যায়নের জন্য অতিরিক্ত ফৌজদারি তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণে ২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক এ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে আরও আগে থেকেই গভীর ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে, যার মূলে ছিল বিদ্যমান রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থার ভঙ্গুরতা ও দুর্নীতি; যেটি কেবল ব্যর্থই হয়নি, প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতার অভাব রেখে দিয়েছে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, পেশাগত এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীর নারী ও শিশুসহ হাজার হাজার বাংলাদেশি বিক্ষোভে যোগ দেয়। তারা অর্থবহ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি তোলে। জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ দমন এবং ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে সাবেক সরকার পদ্ধতিগতভাবে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা ক্রমবর্ধমান সহিংসতারই পথ বেছে নেয়।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে তৎকালীন সরকার এবং আওয়ামী লীগ ক্রমেই বাড়তে থাকা সশস্ত্র শক্তিগুলোকে (আর্মড অ্যাক্টর) মাঠে ছড়িয়ে দিতে থাকে। বিক্ষোভ দমনের প্রাথমিক চেষ্টা হিসেবে সরকারের মন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগ নেতারা ছাত্রলীগের কর্মীদের উসকে দেন। এতে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এবং তার আশেপাশে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর লাঠি ও ধারালো অস্ত্র এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। শিক্ষার্থীরাও কখনো কখনো আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকার আরও গুরুতর সহিংসতার পথ বেছে নেয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ পুলিশ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি সশস্ত্র দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করে এবং অযাচিত ও অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে শান্তিপূর্ণ ছাত্র বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা

BANGLA NEWS24.com

করে। এর মধ্যে ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বড় বিক্ষোভের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য।

এসব ঘটনার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিক্ষোভ এবং ঢাকা ও অন্যান্য শহরে 'শাটডাউন'র (কার্যক্রম বন্ধ) ডাক দেয়, যাতে সমর্থন দেয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াতে ইসলামীও। এর প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন সরকার বিক্ষোভকারী এবং আন্দোলনের সংগঠকদের বিরুদ্ধে আরও সহিংস হয়ে ওঠে। ফলে জনজীবন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার লঙ্ঘিত হয়। একদিকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও পুলিশের হেলিকপ্টার আকাশ থেকে বিক্ষোভকারীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। আরেকদিকে পুলিশ, র‍্যাব ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) রাস্তায় সামরিক রাইফেল এবং লোড করা শটগানের প্রাণঘাতী গুলি ছোড়ে। এছাড়া কম-প্রাণঘাতী অস্ত্রও ব্যবহার করা হয়। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রাস্তা ও কিছু স্থাপনা অবরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনো সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভই চলে আসছিল। এই ধরনের হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য কিছু বিক্ষোভকারী ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও লাঠিসোঁটা ব্যবহারে ধাবিত হন।

BANGLA NEWS 24 .com

এই ক্রমঅবনতিশীল পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, যাতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারি ভবন, পরিবহন অবকাঠামো এবং পুলিশ আক্রান্ত হয়। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় সরকার বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বল প্রয়োগে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতি নির্দেশনা জোরালো করে। ১৯ জুলাই থেকে বিক্ষোভ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিজিবি, র‍্যাব এবং পুলিশ ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে, যার কারণে অনেকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন এবং আহত হন। এদের মধ্যে দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিকও ছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনী উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর খুব কাছ থেকে গুলি ছোড়ে।

তারপরও বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনীর সহিংসতা বিক্ষোভ দমাতে পারেনি, বরং তা আরও বেড়ে যায়। ২০ জুলাই তৎকালীন সরকার কারফিউ (সান্ধ্য আইন) জারি করে এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সৈন্যরা বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ফাঁকা গুলি ছোড়ে, যা প্রাণহানি বা গুরুতর আহত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেনি; কেবল একজন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, মাঠপর্যায়ের জুনিয়র কর্মকর্তারা বেসামরিক নাগরিকদের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশনা মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলেন। ৩ আগস্ট সেনাবাহিনীর এক দরবারেও সেনাপ্রধানকে জানানো হয় যে, জুনিয়র সেনা কর্মকর্তারা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে চান না। তা সত্ত্বেও, সেনাবাহিনী আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের প্রতিরক্ষা সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে আরও সহিংস হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর মধ্য দিয়ে তারা আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াই বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বল প্রয়োগের অনুমতি পায়। এর মধ্যে ২০ ও ২১ জুলাই ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলতে থাকা অবরোধ নৃশংস কায়দায় সরিয়ে দিতে পুলিশ ও র‍্যাব গুলি ছোড়ে, যাতে বেশ কিছু আন্দোলনকারী নিহত ও আহত হন। জুলাইয়ের শেষের দিকে

সেনাবাহিনীও ব্যাপক অভিযানে অংশ নেয়, যেখানে পুলিশ ও র‍্যাব গণবিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে নির্বিচারে বিপুলসংখ্যক মানুষকে ধরপাকড় করে। সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য থেকে আরও জানা যায় যে, ৫ আগস্ট বিক্ষেভকারীরা যে 'মার্চ অন ঢাকা' (আন্দোলনকারীরা এর নাম দেয় 'মার্চ টু ঢাকা') কর্মসূচির ডাক দেয়, তা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে থামানোর জন্য সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশকে কার্যকরভাবে ব্যবহারে সরকারি পরিকল্পনা সাজাতে অংশ নিয়েছিল সেনাবাহিনী ও বিজিবি। সেই পরিকল্পনা অনুসারে পুলিশ অনেক বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা করে, কিন্তু সেনাবাহিনী এবং বিজিবির বড় অংশ নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়েছিল এবং বিক্ষোভকারীদের নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে দেয়।

গোয়েন্দা সংস্থা যেমন-ডিরেক্টরেট জেনারেল অব আর্মড ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই) এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি); পুলিশের বিশেষ শাখা-গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), বিশেষ শাখা (এসবি) এবং কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) প্রতিবাদকারীদের দমনের নামে সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘনে লিপ্ত হয়। তারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করে নজরদারির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এক সংস্থা থেকে আরেক সংস্থার সঙ্গে শেয়ার (ভাগাভাগি) করে, যা জুলাইয়ের শেষের দিকে ব্যাপকহারে নির্বিচারে গ্রেপ্তারের সুযোগ করে দেয়। ডিবি নিয়মিত ও নির্বিচারে আটক করতে থাকে এবং বন্দিদের কাছ থেকে তথ্য ও স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে নির্যাতন চালাতে থাকে। শিশুসহ নির্বিচারে আটক ব্যক্তিদের বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহৃত হয় সিটিটিসি-এর সদর দপ্তর। ডিবি ও ডিজিএফআই একযোগে ছাত্রনেতাদের অপহরণ ও নির্বিচারে আটক করে এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আন্দোলন থেকে সরে আসতে চাপ দেয়। ডিজিএফআই, এনএসআই ও ডিবির লোকজন আহতদের জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা সেবায় বাধা দেয়। হাসপাতালেই রোগীদের জিজ্ঞাসাবাদ, আহত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং চিকিৎসাকর্মীদের ভয়-ভীতি দেখাতে থাকে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড এবং নির্বিচারে আটক ও নির্যাতন বন্ধে আইন সহায়তাকারী কর্তৃপক্ষ বা বিচার বিভাগ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এমনকি এ ধরনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তার জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা হয়নি।

এই পদ্ধতিগত এবং সংগঠিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলো ধামাচাপা দেওয়ার অংশ ছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও। মন্ত্রণালয়গুলোর নির্দেশ বাস্তবায়নে এনটিএমসি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) সঙ্গে একত্রে কাজ করে, যাতে বিক্ষোভকারীরা তাদের কর্মসূচি সংগঠিত করতে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবহারের সুযোগ না পান। এর মধ্য দিয়ে সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আদান-প্রদানে জনগণের অধিকার সংকুচিত করা হয়। একই সঙ্গে ডিজিএফআই, এনএসআই এবং র‍্যাব মিডিয়া আউটলেটগুলিকে গণবিক্ষোভ এবং তাদের সহিংস দমন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ এবং বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট না করতে মিডিয়ার ওপর চাপ দেয়। ডিজিএফআই পুলিশের সঙ্গে মিলে ভিকটিম (হতাহত), তাদের পরিবার এবং আইনজীবীরা যেন চুপ থাকে সেজন্য ভয় দেখাতে থাকে।

ঘটনার সঙ্গে জড়িত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ

BANGLA NEWS 24 .com

সূত্রের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে যে, পুলিশ, আধাসামরিক, সামরিক এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সহিংস উপাদানগুলিকে (সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী) ব্যবহার করে একটি সমন্বিত এবং পদ্ধতিগত পন্থায় গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। আর রাজনৈতিক নেতৃত্বের পূর্ণ জ্ঞাতসারে, সমন্বয় এবং নির্দেশনার ভিত্তিতেই এই নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতাগুলো সমন্বিতভাবে করার যুথবদ্ধ প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিতেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বাস্তবে মাঠপর্যায়ে কী ঘটছে সেই পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন পেতেন তারা উভয়ে। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্তকর্তাদের সাক্ষ্য অনুসারে, ২১ জুলাই এবং আগস্টের শুরুতে প্রধানমন্ত্রীকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তরফ থেকে প্রতিবেদন সরবরাহ করা হয়, যেখানে বিশেষভাবে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের বিষয়ে উদ্বেগের কথাও ছিল। রাজনৈতিক নেতা এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা নিতে সরাসরি মাঠ পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন। এরপর আবার রাজনৈতিক নেতৃত্ব (হাসিনার সরকার) বিজিবি, র‍্যাব, ডিজিএফআই, পুলিশ ও ডিবির জন্য সরাসরি কিছু আদেশ ও নির্দেশনা জারি করে, যার মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ডের অনুমোদন ও দিকনির্দেশ করা হয়। এসব বাহিনী প্রতিবাদকারী ও সাধারণ নাগরিকদের বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা এবং নির্বিচারে আটকের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িয়ে পড়ে।

২০২৪ সালের আগস্টের শুরুতে সাবেক সরকার পর্যায়ক্রমে দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল। লোকজন পাল্টা আক্রমণ থেকে হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য গুরুতর প্রতিশোধমূলক সহিংসতায় যুক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা ও সমর্থক, অনুগত পুলিশ এবং মিডিয়া এ ধরনের সহিংসতার শিকার হয়। বিক্ষোভ চলাকালে এবং পরে, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন, আহমদিয়া সম্প্রদায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বিশৃঙ্খল জনতার (মব) সহিংস আক্রমণের শিকার হন। তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু উপাসনালয়ও আক্রান্ত হয়। এসব আক্রমণে আলাদা আলাদা হেতু (মোটিভ) লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা যেমন আক্রান্ত হয়েছেন, তেমনি আওয়ামী লীগ করা সংখ্যালঘুদের ওপরও প্রতিশোধমূলক হামলার সুযোগ নিয়েছে অনেকে। জমিজমা সংক্রান্ত স্থানীয় বিরোধ, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জেরেও এসব ঘটনা ঘটেছে। জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির কিছু সমর্থক এবং স্থানীয় নেতারা প্রতিশোধমূলক সহিংসতা এবং স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। যাহোক, ওএইচসিএইচআর-এর প্রাপ্ত তথ্যে এটা প্রতীয়মান হয়নি যে, ঘটনাগুলো এসব দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশনায় সংগঠিতভাবে ঘটেছে, বরং তারা সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতার নিন্দা করেছেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনী বা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত কোনো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়নের ঘটনা তদন্ত বা এতে জড়িতদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ সরকার কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

পূর্ববর্তী সরকারের পতনের পর বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গুরুতর মানবাধিকার

BANGLA NEWS 24 .com

লঙ্ঘন এবং নিপীড়নে জড়িতদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, মামলা নিয়মিত আদালতেও চলছে। তবে এই উদ্যোগগুলো নানাদিক থেকে বিঘ্নিত হচ্ছে, যা ঘটছে মূলত আইন প্রয়োগকারী ও বিচার বিভাগের আগের বিদ্যমান কাঠামোগত ত্রুটির কারণে। এর মধ্যে পুলিশের অপকর্ম, যেমন গণমামলায় ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা, কিছু নিরাপত্তা কর্মকর্তার দ্বারা ক্রমাগত ভীতি প্রদর্শন এবং প্রমাণ জালিয়াতির ঘটনা উল্লেখ করা যায়। এমন অপকর্মে জড়িতদের অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, কিন্তু তারা স্বপদে বহাল রয়ে গেছেন। এছাড়া আইসিটি ও অন্যান্য আদালতের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ নিয়েও উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর হামলার ঘটনায় ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানিয়েছে। তবে প্রতিশোধমূলক সহিংসতাসহ অন্যান্য অনেক অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা এখনো দায়মুক্তি ভোগ করছে বলে দেখা যাচ্ছে।

সরকারি নথিবদ্ধ তথ্য ও বেসরকারি সূত্রের পাশাপাশি অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ওএইচসিএইচআর মনে করছে, এ বিক্ষোভ চলাকালে ১,৪০০ জনের মতো মানুষ নিহত হয়ে থাকতে পারে, যাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত সামরিক রাইফেল এবং লোড করা শটগানের প্রাণঘাতী গুলিতে নিহত হয়। আরও হাজার হাজার মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন, অনেকের আঘাত তার স্বাভাবিক জীবনকেই পাল্টে দিয়েছে। ওএইচসিএইচআরের কাছে পুলিশ ও র‍্যাবের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ১১ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়।

হতাহতের পরিসংখ্যান অনুসারে, নিহতদের মধ্যে প্রায় ১২-১৩ শতাংশ শিশু। পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী শিশুদের হত্যার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। শিশুরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে পঙ্গুত্ব, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, অমানবিক পরিস্থিতিতে আটক, নির্যাতনসহ নানা ধরনের অসদাচরণের শিকার হয়েছে।

বিক্ষোভের প্রথম দিকে অগ্রভাগে থাকার কারণে নারী ও মেয়েরা নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের হামলার শিকার হন। তারা বিশেষভাবে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন, এর মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক শারীরিক সহিংসতা, ধর্ষণের হুমকিও ছিল। কিছু নথিভুক্ত ঘটনা অনুসারে, আওয়ামী লীগের সমর্থকরা যৌন নির্যাতনও চালিয়েছেন। ওএইচসিএইচআর প্রতিশোধমূলক সহিংসতা হিসেবে যৌন সহিংসতা এবং ধর্ষণের হুমকি সম্পর্কিত অভিযোগও পেয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং বাংলাদেশে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য কম জানানোর যে চর্চা তার পরিপ্রেক্ষিতে ওএইচসিএইচআর মনে করে যে, তাদের পক্ষে যৌন সহিংসতার সম্পূর্ণ তথ্য নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সংস্থাটি মনে করে, এ ধরনের ঘটনার পুরো বিস্তৃতি নির্ধারণ করতে এবং এর প্রভাব অনুসন্ধানে আগামী দিনে এর গভীর তদন্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে ভিকটিমদের যেন প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যায়।

সেকেলে আইন ও নীতি, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন কাঠামো এবং আইনের শাসনের

BANGLA NEWS 24 .com

অবক্ষয়–যেটা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে শক্তির ব্যবহারের পথ সুগম করেছে–পুলিশের সামরিকীকরণ, নিরাপত্তা ও বিচার বিভাগের রাজনৈতিকীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তির সুযোগই সহিংসতাকে এমন মাত্রা দিয়েছে। সাবেক সরকার শান্তিপূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করার জন্য ব্যাপকভাবে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করেছিল। এমন নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিও সরকারের কিছু বিরোধীর বিক্ষুব্ধ হয়ে সহিংস প্রতিবাদের দিকে ধাবিত হওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

ওএইচসিএইচআর-এর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং যে সময়টার ওপর কাজ করেছে, তখনকার মানবাধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন ও নিপীড়নের ঘটনা এবং এসবের অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলি মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ ও দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার দরকার, যাতে একই ধরনের গুরুতর মানবাধিকারের লঙ্ঘনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। এজন্য ওএইচসিএইচআর এই প্রতিবেদনে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছে, যার মধ্য রয়েছে নিরাপত্তা ও বিচার বিভাগের সংস্কার, দমনমূলক আইন ও নীতি বাতিল, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানে নিয়ে আসার জন্য অন্যান্য আইন সংশোধন, প্রাতিষ্ঠানিক ও শাসন কাঠামো সংস্কার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বৃহত্তর পরিবর্তন, যাতে বৈষম্য কমানো ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়, যার ফলে বাংলাদেশের সব নাগরিকের মর্যাদা ও মানবাধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

এই ক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে ন্যায্য এবং স্বাধীন ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিকারের পদ্ধতি স্থির করতে হবে, যা জাতীয় নিরাময়কে এগিয়ে নেবে। এর অংশ হিসেবে ওএইচসিএইচআর অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় সংলাপ ও পরামর্শের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বাস্তবতানির্ভর ক্রান্তিকালীন বিচার প্রক্রিয়ার সুপারিশ করছে। এই প্রক্রিয়া দাঁড় করানোর লক্ষ্য হবে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে সবচেয়ে দায়ী অপরাধীদের জন্য বিচার নিশ্চিত করা। এটি করা হবে ভিকটিমকেন্দ্রিক এক বৃহৎ পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে যা মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিচার এবং সুরক্ষায় সহায়ক হবে। কাজটি করা হবে সত্যানুসন্ধান, ক্ষতিপূরণ, স্মৃতি সংরক্ষণ, নিরাপত্তা খাতের কর্মকাণ্ড যাচাই-বাছাইসহ অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে, যা এমন অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধের নিশ্চয়তা দেবে। এই ধরনের উদ্যোগ সামাজিক সংহতি, জাতীয় নিরাময় এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের পুনর্মিলনকে সহায়তা করবে।

জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতি সমর্থনের জায়গা থেকে ওএইচসিএইচআর বিক্ষোভসহ বিভিন্ন সময়ে অধিকার লঙ্ঘন এবং নিপীড়নের আরও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের সুপারিশ করছে। ওএইচসিএইচআর এই প্রতিবেদনের সুপারিশের অগ্রগতি ও বাস্তবায়নের সুবিধাসহ বাংলাদেশকে অব্যাহত সহায়তা এবং কারিগরি সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশে (সরাসরি) এবং অনলাইনে ভুক্তভোগী ও অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের ২৩০টিরও বেশি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআরের এসব তথ্যপ্রাপ্তি এবং সুপারিশ। সরকার, নিরাপত্তা বিভাগ এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের আরও

BANGLA NEWS 24 .com

৩৬টি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ঘটনা সংশ্লিষ্ট সরেজমিন অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন অনেক প্রাক্তন এবং বর্তমান সিনিয়র কর্মকর্তারা রয়েছেন। তথ্য-উপাত্তগুলোর সত্যতা সঠিক ভিডিও এবং ছবি, মেডিকেল ফরেনসিক বিশ্লেষণ ও অস্ত্র বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হয়েছে। একটি ঘটনা বা এমন কিছু ঘটেছে এবং তা বিশ্বাস করার মতো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে মনে হলে সেখানে তথ্যানুসন্ধানের কার্যক্রম চালিয়েছে ওএইচসিএইচআর। তবে ফৌজদারি কার্যধারায় একজনের অপরাধ প্রমাণের জন্য এ তথ্যের মান প্রয়োজনীয় মানদণ্ডের চেয়ে কম। সেজন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আরও ফৌজদারি তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে।

BANGLA NEWS24.com

I. পরিচিতি/ ভূমিকা

II. পদ্ধতি, প্রমাণের মানদণ্ড ও প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক বিধি

III. প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা: দমন-পীড়নের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা

১. দ্বিদলীয় রাজনীতি, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

২. ছাত্র আন্দোলন দমন ও অকার্যকর করতে চেষ্টা চালায় সরকার

৩. ছাত্রলীগ, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সংঘবদ্ধ কার্যক্রম

৪. কমপ্লিট শাটডাউন প্রচারণা, আন্দোলনের বিস্তার ও সহিংস আন্দোলন

৫. আন্দোলনের তীব্রতা কমে যাওয়া এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান

৬. শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে নতুন করে গণআন্দোলন

IV. আন্দোলনে হতাহতের সংখ্যা, এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হত্যাকাণ্ড

V. বিক্ষোভ চলাকালে লঙ্ঘন ও নির্যাতন

১. সহিংসতায় সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উসকানি

২. পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির বলপ্রয়োগ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৩. বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত লঙ্ঘনে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা

৪. হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সম্ভাব্য বেআইনি শক্তি প্রয়োগ

৫. চিকিৎসাসেবায় বাধা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নথিপত্র দানে অস্বীকৃতি

৬. নির্বিচারে গণগ্রেপ্তার, যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই আটক এবং নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার

৭. সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন

৮. যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অন্যায়ভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করা

৯. বিক্ষোভকারী নারী ও কিশোরীদের লক্ষ্য করে সহিংসতা ও নির্যাতন

১০. শিশুদের ওপর সহিংসতা এবং নির্যাতন

VI. বিক্ষোভ পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন

১. পুলিশ, আওয়ামী লীগ এবং গণমাধ্যমকে লক্ষ্য করে প্রতিশোধমূলক নির্যাতন

২. বিভিন্ন ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর নির্যাতন

VII. জবাবদিহিতার প্রচেষ্টা

১. ৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রকৃত কোনও জবাবদিহিতামূলক প্রচেষ্টা ছিল না

২. অন্তর্বর্তী সরকারের জবাবদিহিতার প্রচেষ্টা

VIII. আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় সংক্রান্ত অনুসন্ধান

১.সাবেক সরকার ও আওয়ামী লীগ

২. বিক্ষোভ-আন্দোলন, অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ জনগণ

৩. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

IX. মূল কারণগুলো সমাধান করে দমন-পীড়নের পুনরাবৃত্তি রোধ

১. বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের সুযোগ রাখা পুরনো আইন

২. নিরাপত্তা খাতের রাজনৈতিককরণ

৩. প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তি ও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বিচার ব্যবস্থা

৪. নাগরিক পরিসর সংকুচিতকরণ ও দমনমূলক আইনি কাঠামো

৫. আইন ও বাস্তবে কাঠামোগত বৈষম্য

X. সুপারিশসমূহ

১. জবাবদিহিতা এবং বিচার বিভাগ

২. পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগ

৩. নাগরিক পরিসর

৪. রাজনৈতিক ব্যবস্থা

৫. অর্থনৈতিক সুশাসন

BANGLA NEWS 24 .com

I. ভূমিকা

১. ছাত্র আন্দোলন চলাকালে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক ২০২৪ সালের ২৩ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে প্রথমে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পরিচালনার প্রস্তাব দেন। তবে সেই আমন্ত্রণের ইতিবাচক সাড়া তিনি পাননি। পরে একই বছরের ১৪ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস হাইকমিশনারের সঙ্গে এক ফোনালাপে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনকে (ওএইচসিএইচআর) ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন পরিচালনার অনুরোধ জানান। পরে ২৮ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠির মাধ্যমে তিনি আমন্ত্রণ জানান। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে নির্ধারিত শর্তাবলির ভিত্তিতে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ওএইচসিএইচআরের একটি দল বাংলাদেশে পাঠান। তাদের দায়িত্ব ছিল ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে হওয়া আন্দোলনের সময় হওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের ঘটনা স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা।

২. নির্ধারিত শর্তাবলির আওতায় ওএইচসিএইচআরের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের ঘটনাগুলো এবং মূল কারণগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়। শর্তাদিতে ওএইচসিএইচআরকে দায়ীদের চিহ্নিত করা, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে কার্যকর সুপারিশ দেওয়া এবং এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার ও বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত ও কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করতে যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তারও মূল্যায়ন করতে বলা হয়। প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারকে তথ্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল সম্পর্কে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদকে অবহিত রাখার অনুরোধ জানান।

BANGLA NEWS24.com

৩. ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ওএইচসিএইচআরের একটি দল বাংলাদেশে কাজ শুরু করে। এতে একজন করে ফরেনসিক চিকিৎসক, অস্ত্র বিশেষজ্ঞ, লিঙ্গ বিশেষজ্ঞ (জেন্ডার স্পেশালিস্ট), উন্মুক্ত তথ্য বিশ্লেষক, গণমাধ্যম পরামর্শক ও আইন পরামর্শক সহায়তা করেন। সীমিত সময় ও সংস্থানের মধ্যে ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা নথিভুক্ত করতে সক্ষম হয়, তবে পুরো দেশের ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তথ্য-উদ্ধার দল ঢাকা, সিলেট, রংপুর ও নরসিংদীসহ প্রধান বিক্ষোভস্থল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল পরিদর্শন করে। এ ছাড়া, কুমিল্লা, গাজীপুর, জামালপুর, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানের ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নেয়।

৪. ওএইচসিএইচআর অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতা এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ পাওয়ায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। পাশাপাশি, সংস্থাটি বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক নাগরিক সামাজিক সংগঠন, মানবাধিকার কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের প্রতিও কৃতজ্ঞ, যারা তথ্য-উদ্ধার কাজে সহায়তা করেছেন এবং দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সময় সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। বিশেষ করে ওএইচসিএইচআর গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতি, যারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার

বিবরণ তুলে ধরেছেন, যদিও অনেকের জন্যই তা ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও বেদনাময়।

II. পদ্ধতি, প্রমাণের মানদণ্ড ও প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক বিধি

৫. এই প্রতিবেদন মূলত ২৩০টির বেশি গোপন ও বিশদ সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ওইএইচসিএইচআরের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন বাংলাদেশে গিয়ে এবং অনলাইনে যোগাযোগের মাধ্যমে এসব সাক্ষাৎকার নিয়েছে। ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শী, শিক্ষার্থী ও আন্দোলনের নেতা, মানবাধিকারকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন। সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে ৩৫ জন নারী, দুইজন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি এবং ১০ জন শিশু।

৬. ওএইচসিএইচআরের ফরেনসিক চিকিৎসক ১১টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসকদের সঙ্গে পরামর্শ করেন, ২৯ জন ভুক্তভোগীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং তাদের সম্মতিতে ১৫৩টি চিকিৎসা নথি পর্যালোচনা করেন। এর মধ্যে আঘাতের ছবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওএইচসিএইচআরের অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ভিডিও, ছবি এবং সংগৃহীত অস্ত্রের অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারের তথ্য যাচাই করেন। এ ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগী ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েক হাজার মূল ভিডিও এবং ছবি সংরক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছে ওএইচসিএইচআর, যা বিক্ষোভে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এতে জড়িত ব্যক্তি এবং তাদের অস্ত্র ও হামলার ধরন সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ২০ জুলাই ওএইচসিএইচআর একটি দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ দল নিযুক্ত করে, যারা গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য উন্মুক্ত তথ্যসূত্র থেকে প্রাসঙ্গিক ভিডিও এবং ছবি চিহ্নিত করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে। এই তথ্য-উদ্ধার প্রক্রিয়ায় কেবল সেসব ভিডিও এবং ছবির ওপর নির্ভর করা হয়েছে, যেগুলোর সত্যতা ওএইচসিএইচআরের আদর্শ পদ্ধতি অনুসারে যাচাই করা হয়েছে।

৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর্তমান পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এবং বাংলাদেশের তিনটি আধাসামরিক বাহিনীর মহাপরিচালকদের (র‍্যাব, আনসার/ভিডিপি ও বিজিবি) সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয়। তবে, বিজিবি প্রধান ছাড়া বাকি কেউই বিক্ষোভের সময় তাদের বর্তমান পদে ছিলেন না, ফলে সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে তারা সীমিত তথ্যই দিতে পেরেছেন। ওইএইচসিএইচআরের অনুরোধ সত্ত্বেও, অন্তর্বর্তী সরকার সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) শীর্ষস্থানীয়দের সঙ্গে কোনো বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারেনি।

৮. ওএইচসিএইচআর সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার/ভিডিপি, গোয়েন্দা সংস্থা, রাজনৈতিক দল ও বিচার বিভাগের সাবেক ও বর্তমান জ্যেষ্ঠ ও মধ্যস্তরের আরও ৩২ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেয়। তারা প্রত্যেকেই বিক্ষোভ মোকাবিলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন।

BANGLA NEWS 24 .com

৯. কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েকজন সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ওএইচসিএইচআর তাদের সঙ্গে নজরদারির বাইরে এবং ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার সুযোগ পায়। তবে দুঃখজনকভাবে গ্রেপ্তার সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরবর্তী সাক্ষাৎকারের জন্য ওএইচসিএইচআরের অনুরোধ অনুমোদন পায়নি।

১০. ওএইচসিএইচআর আওয়ামী লীগের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। পাশাপাশি সাবেক সরকারের মন্ত্রিসভার চারজন মন্ত্রীর অনলাইনে সাক্ষাৎকার নেয়, যাদের প্রত্যেকে বিক্ষোভ দমনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। এ ছাড়া ওএইচসিএইচআর আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যস্তরের নেতাসহ দলটির ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাদেরও সাক্ষাৎকার নেয়।

১১. ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতাদের সাক্ষাৎকার নেয়। জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের চেষ্টা করা হলেও তারা সাক্ষাতের সুযোগ দেয়নি। জামায়াতে ইসলামী সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কাছে সাক্ষাৎকারের অনুরোধ পাঠানো হলেও কোনো সাড়া মেলেনি। তবে ওএইচসিএইচআর জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের বেশ কয়েকজন সমর্থকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিতে সক্ষম হয়।

১২. গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর ওএইচসিএইচআর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বিস্তারিত লিখিত তথ্যের জন্য একটি অনুরোধ পাঠায়। পরে ৯ ডিসেম্বর সরকার কিছু তথ্য সরবরাহ করে, যার মধ্যে বিজিবি, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) এবং তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ প্রতিবেদন এবং ডিজিএফআই, আনসার/ভিডিপি ও কোস্ট গার্ডের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর ২০২৫ সালের ৩০ জানুয়ারি অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশ পুলিশ ও র‍্যাবের একটি অতিরিক্ত বিশদ প্রতিবেদন সরবরাহ করে। তবে দুঃখজনকভাবে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো লিখিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৩. ওএইচসিএইচআরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্যক্তি ও সংস্থার পক্ষ থেকে মোট ৯৫৯টি তথ্য উপস্থাপিত হয়। ওএইচসিএইচআর প্রতিটি তথ্য পর্যালোচনা এবং সংরক্ষণ করেছে।

১৪. ওএইচসিএইচআর তার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিটি সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তাদের দেওয়া তথ্যের যথার্থতা, সামঞ্জস্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা কঠোরভাবে মূল্যায়ন করেছে। যদি ভিন্নভাবে উল্লেখ না করা হয়, তাহলে এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘন বা নির্যাতনের ঘটনা ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্রের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যাচাই করা হয়েছে। এগুলো অন্যান্য সাক্ষ্য, নিশ্চিত করা ভিডিও ও ছবি, চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ও ফরেনসিক বিশ্লেষণ, অস্ত্র বিশ্লেষণ বা বিশ্বস্ত উন্মুক্ত সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থান, তারিখ, অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় বা অন্যান্য সংবেদনশীল তথ্য, যেগুলো ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, সেগুলো প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে, এসব তথ্য ওএইচসিএইচআরের

BANGLA NEWS 24.com

কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

১৫. ওএইচসিএইচআরের পদ্ধতি অনুসারে যখন কোনো ঘটনা বা আচরণের ধরন ঘটেছে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করার মতো প্রমাণ পাওয়া গেছে, তখন এই প্রতিবেদনে সেই বিষয়ক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রমাণের মানদণ্ড ফৌজদারি আদালতে কাউকে দোষী প্রমাণের জন্য যতটা কঠোর হওয়া দরকার, ততটা কঠোর নয়। তবে এটা ততটা শক্তিশালী, যতটা দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিচারিক কর্তৃপক্ষ গুরুতর অপরাধের অধিকতর তদন্ত শুরু করতে পারে। ওএইচসিএইচআরের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন আটটি ঘটনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছে, যা বিস্তৃত প্রবণতার প্রতিফলন বা সরাসরি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা, আদেশ ও নির্দেশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

১৬. প্রতিবেদনে উপস্থাপিত মানবাধিকারসংক্রান্ত অনুসন্ধানমূলক ফলাফল প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা রাষ্ট্রের জন্য দায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘন বা অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঘটে যাওয়া মানবাধিকার নির্যাতনের বিষয়ে প্রযোজ্য। এসব বিশ্লেষণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে করা হয়েছে, যেখানে জাতিসংঘের মৌলিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের দায়বদ্ধতাও অন্তর্ভুক্ত।

১৭. এ ছাড়া ওএইচসিএইচআর পর্যালোচনা করেছে যে, যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলো বাংলাদেশ বা অন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ, বিশেষ করে রোম স্ট্যাটিউট অনুযায়ী মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধের আরও তদন্তের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে কি না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রোম স্ট্যাটিউটের সদস্য রাষ্ট্র। এই প্রতিবেদনে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ তদন্তের সুপারিশ করা হয়নি। তবে ওএইচসিএইচআর ভবিষ্যতে জবাবদিহির প্রক্রিয়া সহজ করতে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সংরক্ষণ করেছে।

BANGLA NEWS 24 .com

১৮. ওএইচসিএইচআরের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদনটি প্রকাশের আগে অন্তর্বর্তী সরকারকে জানানো হয়েছিল, যাতে তারা কোনো তথ্যগত ভুল বা অসংগতি সম্পর্কে মতামত জানাতে পারে। প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলো প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে।

III. প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা: দমন-পীড়নের ক্রমবর্ধমান তীব্রতা

১৯. ২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি রায়ে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহাল করেন। আদালত ২০১৮ সালে সরকারের নেওয়া সেই সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন। ওই সময়ে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের পর কোটা ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল।

২০. শিক্ষার্থীরা কোটা ব্যবস্থাকে বৈষম্যমূলক বলে মনে করেন। তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের কিছু সমর্থকও ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মতে, এটি মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিদের অগ্রাধিকার দেয়, যা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগের নীতির পরিপন্থি। অনেক কোটা সুবিধাভোগী এমন পরিবার থেকে এসেছেন, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত। ছাত্র

আন্দোলনকারীদের একজন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "সরকারি চাকরির সুযোগ আমার জন্য নেই, কারণ আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নই। আমি শুধু গ্রামের একজন সাধারণ ছেলে।"

২১. ছাত্র আন্দোলনের মূল কারণ শুধু কোটা ব্যবস্থাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এর গভীরে ছিল বিগত সরকারের রাজনৈতিক এজেন্ডা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বঞ্চনার বিরুদ্ধে জমে থাকা দীর্ঘদিনের ক্ষোভ। আন্দোলনের নেতা ও অংশগ্রহণকারীরা ওএইচসিএইচআরের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের ক্ষোভ দারুণভাবে উঠে আসে এক নারী আন্দোলনকারীর লেখা এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া একটি গানে: "তেলা মাথায় দিচ্ছে তেল, দুর্নীতির কাছে সবই ফেল, ভালা মাইনসের কোনো ভাত নাই (একেতো কোটার বাঁশ, তার উপরে প্রশ্নফাঁস)"। অল্প সময়ের মধ্যেই আন্দোলন সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতিবাদে রূপ নেয়। অধিকাংশ বাংলাদেশিই এই আন্দোলনের সঙ্গে একমত ছিলেন এবং তারা মনে করতেন, দেশ ভুল পথে এগোচ্ছে।

২২. সরকার প্রতিবাদ আন্দোলন ঠেকাতে ধাপে ধাপে পরিকল্পিত ও পদ্ধতিগতভাবে দমনপীড়ন বাড়িয়ে তোলে। প্রথমে ভয়ভীতি দেখানোর চেষ্টা করা হলেও পরে ধীরে ধীরে আরও প্রাণঘাতী ও সামরিক কৌশলে দমন অভিযান চালানো হয়, যার ফলে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে।

BANGLA NEWS 24.com

২৩. এই অংশে প্রতিবাদের পেছনের মূল কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিক্রিয়ায় দমনপীড়ন কীভাবে ধাপে ধাপে বেড়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।

১. দ্বিদলীয় রাজনীতি, দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক বৈষম্য

২৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো ঐতিহাসিকভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে এসেছে, যেখানে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি চালানো হয়েছে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আগে এই ধরনের চর্চার প্রভাব কিছুটা প্রশমিত হতো, কারণ জনগণ নিয়মিতভাবে ক্ষমতাসীন দলকে ভোটের মাধ্যমে সরিয়ে দিত। এটি সম্ভব ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো সাংবিধানিক ব্যবস্থার কারণে, যা নির্বাচনের আগে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার চেষ্টা করত। তবে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ের পর আওয়ামী লীগ এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। পরে দলটি ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়, যা অনিয়ম, সহিংসতা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ২০১৪ সালের নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ভোট বর্জন করে। ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবারও বিজয়ী হয়। এই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ থাকে এবং সরকারবিরোধী সমাবেশ কঠোরভাবে দমন, বিরোধী দলের হাজারো কর্মীর নির্বিচার গ্রেপ্তার এবং নাগরিক সমাজের ওপর ভয় প্রদর্শনের কারণে বিএনপি ভোট বর্জন করে।

২৫. শাসনকালে শেখ হাসিনা ও তার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে বিচার ও নিরাপত্তা খাত এবং সরকারি প্রশাসনের ওপর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতিতেও ছড়িয়ে পড়ে, যা

স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীস্বার্থভিত্তিক পুঁজিবাদ ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সাবেক সরকার সাধারণত বড় ব্যবসা ও রপ্তানি শিল্প– বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাত এবং বড় অবকাঠামো প্রকল্পগুলোকেই অগ্রাধিকার দেয়, ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৩ সালের পর থেকে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ার দাবি করলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল সবার মধ্যে সমানভাবে বণ্টন হয়নি। ২০১০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে আয় ও ব্যয়ের বৈষম্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে এবং দেশের শীর্ষ ০৫ শতাংশ ধনী জনগোষ্ঠীর কাছে থাকা সম্পদ আরও বেড়ে যায়।

২৬. শিক্ষার্থী ও তরুণদের জন্য বেসরকারি খাতে চাকরি পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল, যা তাদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ তৈরি করে। বিশেষ করে, সরকারি চাকরিতে প্রবেশাধিকারে কোটা ব্যবস্থার প্রভাব নিয়ে তাদের ক্ষোভ ছিল প্রবল। ২০২৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত একটি সরকারি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের প্রায় ৪০ শতাংশই শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের বাইরে। তরুণী ও নারীদের ক্ষেত্রে এই হার আরও বেশি–প্রায় ৬০ শতাংশ।

২৭. ২০২২ সাল থেকে মধ্য ও নিম্নআয়ের বাংলাদেশি নাগরিকেরা খাদ্য ও জ্বালানির ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির চাপ আরও বেশি অনুভব করতে থাকে। এর পেছনে মূলত রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের প্রভাব, কৃষিখাতে ভর্তুকি কমানো এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণের শর্ত হিসেবে সরকার যে কৃচ্ছ্রসাধনের নীতি গ্রহণ করে, তার ভূমিকা ছিল। এ ছাড়া বাংলাদেশের ঋণ পরিশোধে ক্রমবর্ধমান অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার খাতে রাষ্ট্রের ব্যয় আরও কমে যায়। পাশাপাশি, দেশের কর ব্যবস্থা মূলত পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীল, যা অসমভাবে মধ্য ও নিম্নআয়ের মানুষের ওপর বেশি চাপ সৃষ্টি করে।

২৮. অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণ এবং দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যবসায়ী বড় ব্যাংক, জ্বালানি খাত ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। বড় ব্যাংকগুলো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সুবিধা দিতে বিশাল অঙ্কের ঋণ জালিয়াতির শিকার হয়, যা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ঝুঁকি সৃষ্টি করে। অবৈধ উপার্জনের একটি বড় অংশ দেশের বাইরে পাচার করা হয় এবং বিদেশি সংস্থাগুলোতে বিনিয়োগ করা হয়, যা দুর্নীতিগ্রস্ত বাংলাদেশি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে।

২৯. উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির প্রতিফলন প্রশাসন ও নিরাপত্তা সংস্থার নিম্ন স্তরে ব্যাপক দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। একটি সাম্প্রতিক জরিপ অনুসারে, প্রতি চারজন বাংলাদেশির মধ্যে তিনজন (৭৪ দশমিক ৪ শতাংশ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুর্নীতির শিকার। আন্দোলনে যোগ দেওয়া। অনেক শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থী ওএইচসিএইচআরের কাছে তাদের হতাশা প্রকাশ করেছেন। তারা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও ছাত্রলীগ সদস্যদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ করেছেন।

২. ছাত্র আন্দোলনকে ভীতি প্রদর্শন এবং অবৈধকরণের চেষ্টা চালায় সরকার

৩০. জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর) সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানায়, শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মকর্তারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন, ২০২৪ সালের জুলাইয়ের কোটা আন্দোলন সরকারের টিকে থাকার জন্য বড় রাজনৈতিক হুমকি হয়ে উঠছে। তারা সতর্ক করেন যে বিরোধী দলগুলোর নেতারাও এতে যোগ দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীকে দ্রুত সমাধানে পৌঁছানোর মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দেন। তবে প্রধানমন্ত্রী কঠোর অবস্থান নেন এবং গোপনে শীর্ষ কর্মকর্তাদের জানান, শিক্ষার্থীরা শিগগিরই বুঝতে পারবে যে তাদের আন্দোলন ব্যর্থ। ৭ জুলাই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, '(উচ্চ) আদালতের রায়ের পর কোটাবিরোধী আন্দোলনের আর কোনো যৌক্তিকতা নেই'। এরপর শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে দাবি করতে থাকেন, ছাত্র আন্দোলনে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের "অনুপ্রবেশ" ঘটেছে।

৩১. সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তাদের মতে, ১০ থেকে ১১ জুলাই রাতের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ডিজিএফআই মহাপরিচালক ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষার্থী নেতাদের সঙ্গে গোপন সমঝোতার অনুমতি দেন। ব্যাপক ভীতি সঞ্চারকারী এই সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে তিনি আলোচনার দায়িত্ব দেন।

৩২. ১১ জুলাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন প্রকাশ্যে হুঁশিয়ারি দেন, 'কেউ কেউ আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে, আর ছাত্রলীগ তাদের মোকাবিলায় প্রস্তুত'। সেই দিনই পুলিশ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলনে লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ ছাড়া শাহবাগ এলাকায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং চট্টগ্রামেও একই ধরনের ঘটনার খবর পাওয়া যায়। ১৩ জুলাই ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) আন্দোলনে (বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের) কথিত 'অনুপ্রবেশের' তদন্ত শুরু করার ঘোষণা দেয়।

৩৩. ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'ওদের (ছাত্র আন্দোলনকারীদের) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি এত ক্ষোভ কেন? যদি মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিরা কোটার সুবিধা না পায়, তাহলে কি রাজাকারদের নাতি-নাতনিরা সেই সুবিধা পাবে?'

৩৪. প্রধানমন্ত্রীর 'রাজাকার' মন্তব্যে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের শিকার বলে মনে করেন। বাংলাদেশে এই শব্দটি অত্যন্ত অবমাননাকর, যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ১৪ জুলাই সন্ধ্যায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের বিশাল জমায়েত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং স্লোগান তোলে–'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার'। এই স্লোগান দ্রুত আন্দোলনের মূল কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়, যা পরে আরেকটু দীর্ঘ হয়ে দাঁড়ায়– 'কে বলছে? কে বলছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার!' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শত শত ছাত্রী হলের রাতের তালা ভেঙে বিক্ষোভে যোগ দেন।

BANGLA NEWS 24 .com

ছবি ১: ২০২৪ সালের ৭ জুলাই ঢাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।
ছবি সূত্র: অনুমতি নথিভুক্ত

৩৫. শিক্ষার্থীদের 'রাজাকার' স্লোগানের প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন কয়েকজন মন্ত্রী প্রকাশ্যে ইঙ্গিত দেন যে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সহ্য করার সময় শেষ। ১৪ জুলাই সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, 'এই রাষ্ট্রের পক্ষে এই বিশ্বাসঘাতকদের সম্মান জানানো সম্ভব নয়', পাশাপাশি তিনি আন্দোলনকারীদের 'এ যুগের রাজাকার' বলে আখ্যায়িত করেন। তখনকার তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আরাফাত ঘোষণা দেন, 'যারা রাজাকার হতে চায়, তাদের কোনো দাবিই মেনে নেওয়া হবে না'। একইভাবে সাবেক সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী দীপু মনি বলেন, 'যারা নিজেদের রাজাকার বলে পরিচয় দেয়, তাদের (বাংলাদেশের) জাতীয় পতাকা কপালে বেঁধে মিছিল করার অধিকার নেই'।

BANGLA NEWS 24 .com

৩. ছাত্রলীগ, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সংঘবদ্ধ কার্যক্রম

৩৬. ১৪ জুলাইয়ের পরবর্তী দুই দিন ধরে এই হামলা অব্যাহত ছিল। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। আন্দোলনকারীরা ছাত্রলীগের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার কাজটিও চালিয়ে যেতে থাকেন। ওএইচসিএইচআর জানতে পারে, এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা ছিল নির্বিকার। এক নেতা ওএইচসিএইচআরকে বলেন, 'আমাদের (আওয়ামী লীগের) সাধারণ সম্পাদকের আহ্বানে মাঠে নেমে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ঠেকানোর কথা ছিল ছাত্রলীগ কর্মীদের। কিন্তু যা ঘটে তা অপ্রত্যাশিত ছিল, শিক্ষার্থীরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।'

৩৭. ছাত্রলীগ এককভাবে ক্রমবর্ধমান আন্দোলন দমন করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি অর্জনে ব্যর্থ হলে পুলিশ আরও বেশি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পুলিশ আন্দোলনকারীদের ওপর কম-মারাত্মক অস্ত্র যেমন টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করলেও কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী ধাতব গুলিভর্তি বন্দুক ব্যবহার করে। অন্যদিকে, সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা পুলিশের সহায়তায় হামলা চালান। এসব হামলায় ১৬ জুলাই অন্তত ছয়জন নিহত হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন (রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের) শিক্ষার্থী

আবু সাঈদ (কেস/ঘটনা-১)। তার হত্যার ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে আরও বেশি শিক্ষার্থী, বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে যোগ দেন।

৩৮. ব্যাপক বিক্ষোভ ও সহিংসতা শুরু হওয়ার আগে থেকেই সরকার আরও সামরিক কৌশল ব্যবহারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পুলিশকে সহায়তা করতে আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়, যারা সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। সাবেক এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলছিলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনে করতেন, "যদি আমরা আমাদের 'হেভি ইউনিট' মোতায়েন করি, তাহলে কেবল 'জিহাদিরাই' রাস্তায় থাকবে, আর অন্যরা ঘরে ফিরে যাবে।"

৩৯. ১০ জুলাই থেকে দেশব্যাপী পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব মোতায়েন করা হয়। আন্দোলন চলাকালীন, র‍্যাবের ১৫টি ব্যাটালিয়ন সক্রিয় ছিল। ১৫ জুলাই থেকে আনসার ও ভিডিপির অন্তত ১৪টি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়। ১৬ জুলাই থেকে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। বাহিনীটি ৫৮টি স্থানে তাদের প্রায় চার হাজার সদস্য পাঠায়। বিভিন্ন অভিযানে সহায়তা করতে একই দিনে ছয়টি সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়। তারা শটগান ও রাইফেল ব্যবহার করে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই) প্রায় ১১০ জন কর্মকর্তা ও ৯০০ মাঠকর্মীকে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠায়, অন্যদিকে ১৪০ জন কর্মকর্তা ও এক হাজার কর্মী এসব তথ্য ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন। ১৭ জুলাই র‍্যাব ও বিজিবি পুলিশের সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কেস-২) একটি বড় ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করা হয়। তবে এর ফলে আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

BANGLA NEWS 24 .com

৪০. বিভিন্ন নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়, মোতায়েন নির্দেশনা, অভিযান পরিকল্পনা; আন্দোলন ও তা দমনের প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণের জন্য তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়মিত 'কোর কমিটি' নামের একটি সংস্থার বৈঠক পরিচালনা করতেন। অংশগ্রহণকারী ও অন্যান্য শীর্ষ কর্মকর্তারা জানান, আন্দোলনের সময় তিনি কয়েকদিন সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে এই কমিটির বৈঠক করেন। এতে তিনিই নেতৃত্ব দিতেন। এ ছাড়া পুলিশের মহাপরিদর্শক, বিজিবি, র‍্যাব ও আনসার/ভিডিপির মহাপরিচালক, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান (ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশের বিশেষ শাখা এবং প্রায়শই এনটিএমসি), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার উপস্থিত থাকতেন। ২০ জুলাই থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ জেনারেল এতে উপস্থিত থাকতেন। একই সময়ে শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি ও টেলিফোনে আলোচনা করেন। সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার এবং ওএইচসিএইচআরে জমা দেওয়া কল রেকর্ড অনুযায়ী, তারা সরাসরি এসব অভিযানের তদারকি ও নির্দেশনা দেন।

বাংলাদেশে পুলিশের সামরিকীকরণ

বাংলাদেশে আইন প্রয়োগ ও জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় ক্রমশ এমন সংস্থাগুলোর সম্পৃক্ততা বাড়ছে, যাদের কার্যপ্রণালী, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও সরঞ্জাম পুলিশের তুলনায় বেশি সামরিক ধাঁচের। এসব সংস্থা তাদের কার্যপ্রণালী, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও সরঞ্জামের ক্ষেত্রে আরও সামরিক কায়দায় পরিচালিত হয় এবং সশস্ত্র বাহিনী থেকে প্রেষণে আসা সামরিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সংস্থাগুলো সহজেই প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করে এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িয়ে পড়ে। এক শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা ওএইচসিএইচআরে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, 'তাদের গুলি করার পদ্ধতি আলাদা: এক গুলি, এক মৃত্যু'। (অর্থাৎ, যখন গুলি করা হয়, তখন সেটি নিশ্চিতভাবে কাউকে হত্যা করার জন্যই করা হয়)।

২০০৪ সালে গুরুতর অপরাধ ও সন্ত্রাস দমনের জন্য প্রতিষ্ঠিত র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) একটি আধাসামরিক বাহিনী, যেখানে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তারা প্রেষণে নিয়োজিত থাকেন। এই বাহিনী সামরিক অস্ত্র ও হেলিকপ্টারসহ উন্নত সরঞ্জামে সজ্জিত। যদিও র‍্যাবের আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব একজন পুলিশ কর্মকর্তার হাতে, এর কার্যক্রম মূলত প্রেষণে আসা একজন সেনা কর্নেল নিয়ন্ত্রণ করেন। দুই দশকের বেশি সময় ধরে র‍্যাব বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, নির্যাতনসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইতিহাস তৈরি করেছে, যেখানে তাদের লক্ষ্য ছিল সন্দেহভাজন অপরাধী, বিরোধী রাজনীতিক, নাগরিক সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নন– এমন কর্মকর্তারা।

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মূলত আধাসামরিক বাহিনী, যার সরঞ্জাম ও কাঠামো বেসামরিক সংস্থার চেয়ে অনেক বেশি সামরিক ধাঁচের। মেজর পদ থেকে উপরের সব স্তরে এটি প্রেষণে আসা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। বিজিবির মূল দায়িত্ব সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ হলেও আইন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়ও বাহিনীটি মোতায়েন করা যায়। বিগত সরকার বিজিবির দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা বাড়াতে থাকে, তবে তাদের কম প্রাণঘাতী অস্ত্র সরবরাহ করেনি। ২০১৩ ও ২০১৮ সালে বিজিবি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগসহ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বাহিনীটির মহাপরিচালক ওএইচসিএইচআরকে জানান, বিজিবি মূলত একটি যুদ্ধবাহিনী হিসেবে গঠিত হয়েছে এবং এটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপযুক্ত নয়।

BANGLA NEWS 24 .com

ছবি ২: ২০২৪ সালের ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্দোলনে বিজিবি মোতায়েন করা হয়।

ছবি সূত্র: অনুমতি নথিভুক্ত

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (আনসার/ভিডিপি) একটি আধাসামরিক বাহিনী, যা প্রেষণে আসা সেনা কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তবে আনসারকে নিয়মিতভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যবহার করা হয়, যেমন পুলিশকে সহায়তা করা বা সরকারি ভবনের নিরাপত্তা দেওয়ার মতো কাজে।

সীমিত সামরিক গোয়েন্দা কার্যক্রমের বাইরে গিয়ে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) একটি বৃহৎ কাঠামোতে পরিণত হয়েছে, যা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর নজরদারির মতো অ-সামরিক কার্যক্রমেও জড়িত। আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা না থাকলেও ডিজিএফআই অপহরণ ও গুমের ঘটনায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া সংস্থাটি গণমাধ্যমকর্মী, ব্যবসায়িক নেতা ও অন্যান্য ব্যক্তিদের ভয় দেখানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) এবং জাতীয় টেলিযোগাযোগ নজরদারি কেন্দ্র (এনটিএমসি)–উভয় সংস্থার নেতৃত্বে ছিলেন প্রেষণে আসা সেনা কর্মকর্তারা। তারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করতেন।

এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সময়ে এসব সংস্থা সরাসরি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং এগুলোর ওপর কোনো স্বাধীন বা সংসদীয় নজরদারি ছিল না। বিজিবি, আনসার/ভিডিপি, এনটিএমসি ও র‍্যাবের মহাপরিচালকেরা সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করতেন। এনএসআই প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি রিপোর্ট করতো আর ডিজিএফআই প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার কাছে রিপোর্ট করতো। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্থাগুলোকে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থে গুরুতর আইন লঙ্ঘনের কাজে ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে।

BANGLA NEWS 24 .com

৪. কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি, বিক্ষোভের সাধারণীকরণ এবং সহিংস অস্থিরতা

৪১. আন্দোলনকারীদের শান্ত করতে তখনকার সরকার ১৬ জুলাই হাইকোর্টের কোটা সংক্রান্ত ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন করে, যে রায় থেকেই মূলত আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পরদিন অর্থাৎ ১৭ জুলাই সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার আহ্বান জানান। তিনি ১৬ জুলাইয়ের প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন এবং দাবি করেন, আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ সহযোগিতা করেছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ আন্দোলনের নেতাদের কাছে আন্তরিক বলে মনে হয়নি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেশজুড়ে 'কমপ্লিট শাটডাউনের' ডাক দেয়। তারা ব্যাখ্যা করে, এই শাটডাউনে হাসপাতাল ও জরুরি সেবা চালু থাকবে, তবে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে না এবং অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোনো যানবাহন রাস্তায় চলতে পারবে না। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতারা তাদের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের এই শাটডাউনকে সমর্থন করার আহ্বান জানায়।

BANGLA NEWS 24 .com

৪২. এই পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আইনমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও তথ্য প্রতিমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেন। একইসঙ্গে ডিজিএফআইয়ের প্রচেষ্টাও চলতে থাকে। তবে তখন শিক্ষার্থীরা আর আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন না, কারণ আন্দোলনে ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলার পর সরকারের সদিচ্ছার প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

৪৩. ১৮ জুলাই থেকে সাধারণ জনগণও রাস্তায় নেমে আসে। আন্দোলনকারীরা গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনী দমন-পীড়নে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগের পথে হাঁটে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী রাইফেল, পিস্তল ও শটগানের পাশাপাশি কম প্রাণঘাতী অস্ত্রও ব্যবহার করে। এর ফলে উত্তরাসহ (কেস-৩) বিভিন্ন স্থানে হত্যাকাণ্ড ঘটে, পাশাপাশি আহতদের চিকিৎসাসেবায় ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা দেওয়া হয় (কেস-৮)।

৪৪. নানা বয়সের, শ্রেণিপেশার, নানা দলের লোকজন অংশ নিতে থাকলে আন্দোলনে আরও বৈচিত্র্য আসে। আন্দোলনকারীদের কিছু অংশ পুলিশ সদস্যদের ওপর এবং পরিবহন অবকাঠামো ও সরকারি ভবন, বিশেষ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনে হামলা চালায়। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় সরকার বিজিবিকে সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দেয় এবং ২৩ জুলাই পর্যন্ত দেশে পূর্ণাঙ্গভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করার আদেশ দেয়। ১৯ জুলাই বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব ও অন্যান্য বাহিনী রামপুরা ও বাড্ডাসহ (কেস-৪) ঢাকার বিভিন্ন স্থান এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে লোকজনের জমায়েত লক্ষ্য করে গুলি চালায়, তবে তারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ বা সহিংস অস্থিরতা থামাতে পারেনি। সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে কারফিউ আরোপের নির্দেশ দেন, যা মধ্যরাত থেকে কার্যকর হয়। ২৭ হাজার সেনাসদস্য মোতায়েন করা হয়। ২০ ও ২১ জুলাই নিরাপত্তা বাহিনী বড় ধরনের অভিযান

চালায়, যাতে তারা আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো চালু রাখতে সামরিক রাইফেল ও শটগান ব্যবহার করে। এর মধ্যে ছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক মুক্ত করতে যাত্রাবাড়ীতে (কেস-৫) পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর চালানো যৌথ অভিযান।

৫. বিক্ষোভে ভাটা এবং গণগ্রেপ্তার অভিযান

৪৫. ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট একটি নতুন রায় দেন। এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়। সরকার দ্রুত আদালতের রায় মেনে নেয় এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়। তবে তখনই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আরও বাড়িয়ে দেয়। তাদের দাবির মধ্যে ছিল তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ কয়েকজনকে বরখাস্ত করা এবং হত্যাকাণ্ডে দায়ী পুলিশ সদস্য ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের শাস্তির আওতায় আনা।

৪৬. পথেঘাটে আন্দোলনের তীব্রতা সাময়িকভাবে কমে গেলেও নিরাপত্তা বাহিনী আন্দোলনে জড়িত সন্দেহে শিক্ষার্থী, বিরোধী সমর্থকসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করে। অনেক সময় তাদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কার্যকলাপের কোনো প্রমাণ ছাড়াই আটক করা হয় এবং বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের ওপর নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ করা হয়। জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ ছয় ছাত্রনেতাকে (বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক) গ্রেপ্তার করে আটকে রাখে। ২৮ জুলাই তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধান (মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ) একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। তাতে ছাত্রনেতাদের আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে বাধ্য করা হয়। এ ঘটনায় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম হয়।

BANGLA NEWS 24 .com

৪৭. তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুলাই ভাঙচুরের শিকার একটি মেট্রোস্টেশন এবং ২৬ জুলাই অগ্নিসংযোগের শিকার বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন পরিদর্শন করেন। একই দিনে তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে যান, যেখানে পুলিশ ও বিজিবির গুলিতে আহত অনেককে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। ২৮ জুলাই তিনি নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের নিজ বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান। তিনি প্রকাশ্যে সব সহিংসতা ও প্রাণহানির সম্পূর্ণ দায় বিরোধী দলগুলোর ওপর চাপিয়ে দেন।

৪৮. ২৬ জুলাই বিএনপি প্রকাশ্যে সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ অন্যান্য শক্তির মধ্যে 'জাতীয় ঐক্যে'র আহ্বান জানায় এবং সরকার পতনের দাবিতে এক হওয়ার ডাক দেয়। ৩০ জুলাই সরকার জামায়াতে ইসলামী ও তাদের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৪৯. এসব ঘটনা ২০২৪ সালের আগস্টের শুরুতে গণবিক্ষোভ ও সহিংস আন্দোলন পুনরায় ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

৬. শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে নতুন করে গণআন্দোলন

৫০. যখন আন্দোলন আবার জোরালো হয়, তখন আন্দোলনকারীরা একটিই দাবি তোলেন– তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের পদত্যাগ। এর প্রতিক্রিয়ায় নিরাপত্তা বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা নেয়, এমনকি প্রাণঘাতী শক্তিও ব্যবহার করে। আগস্টের শুরুতে একজন জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপত্তা বাহিনীর শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে উদ্বেগ জানান।

৫১. সেনাবাহিনী রাস্তায় মোতায়েন থাকলেও বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সমর্থন সেনাদের মধ্যে কমতে থাকে। ৩ আগস্ট সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকেন, যেখানে জুনিয়র কর্মকর্তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তারা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে চান না।

৫২. বিক্ষোভকারীরা ৫ আগস্ট মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেন (‘মার্চ অন ঢাকা’ কেস-৬)। এর আগের দিন ৪ আগস্ট, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রধানসহ স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। তারা ঢাকা অভিমুখী মার্চ ঠেকাতে কারফিউ পুনরায় জারি এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা করেন। ৪ আগস্ট রাতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সেনাপ্রধান ও নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন যে ঢাকা সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বৈঠকে একটি পরিকল্পনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে বিক্ষোভকারীদের ঢাকার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশে বাধা দিতে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও বিজিবি মোতায়েন করা হবে। ৫ আগস্ট লাখো বিক্ষোভকারী কেন্দ্রীয় ঢাকার দিকে এগিয়ে যান। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়। তবে সেনাবাহিনী ও বিজিবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকে এবং বিক্ষোভকারীদের অগ্রসর হতে দেয়। তবে অন্তত একটি স্থানে, যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে, সেনারা গুলি চালায় (কেস-৭)।

৫৩. সকালের পরপরই সেনাপ্রধান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে জানান, সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের তার বাসভবনে পৌঁছানো ঠেকাতে পারবে না। দুপুর ২টার দিকে সশস্ত্র বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে শেখ হাসিনাকে ঢাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং পরে তিনি দেশত্যাগ করেন। এর কিছুক্ষণ পরই আন্দোলনকারীরা তার সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করেন।

৫৪. সেনাপ্রধান এক ভাষণে জানান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়েছেন। তিনি একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ‘সমস্ত হত্যার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা’র আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি আন্দোলনকারীদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন ‘পুনরায় সহিংসতার পথে ফিরে না যান’। এরপরও উত্তেজিত জনতা প্রতিশোধমূলক হামলা চালায়– পুলিশ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, গণমাধ্যম ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে বিবেচিত ব্যক্তিদের

BANGLA NEWS 24 .com

ওপর আক্রমণ করে। এর সঙ্গে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ভিন্ন ধর্মীয় এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকজনের বিরুদ্ধেও সহিংসতা চালায়।

৫৫. ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট সেনা নেতৃত্ব ছাত্র আন্দোলনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিতে সম্মত হয়। এই সরকারে ছাত্র আন্দোলনের নেতা, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তাসহ নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত হন।

IV. আন্দোলনে হতাহতের সংখ্যা, এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হত্যাকাণ্ড

এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা পর্যন্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী আন্দোলন সংশ্লিষ্ট মৃত্যুর সংখ্যা ৮৪১, যার মধ্যে ১০ জন নারী। এ ছাড়া মোট ১২ হাজার ২৭২ জন আহত হয়েছেন, যার মধ্যে ৩৯৪ জন নারী এবং ৪ জন ‘অন্যান্য’ হিসেবে তালিকাভুক্ত। এই তথ্য সম্ভবত অসম্পূর্ণ, কারণ নিহত ও আহতদের ব্যাপক চাপের কারণে চিকিৎসাকর্মীরা হিমশিম খেয়েছিলেন, ফলে অনেক ঘটনা ঠিকভাবে নথিভুক্ত করা যায়নি। অনেক রোগী গ্রেপ্তার ও প্রতিশোধের ভয়ে নাম না দিয়ে কিংবা ভুয়া নাম ব্যবহার করে চিকিৎসা নেন, কেউ কেউ আবার নিবন্ধন ছাড়াই চিকিৎসা নেন। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আন্দোলনে সম্পৃক্ততার অভিযোগে প্রতিশোধের শিকার হতে পারেন, এমন আশঙ্কায় অনেক পরিবার দ্রুত প্রিয়জনের মরদেহ নিয়ে যায়, যেন ময়নাতদন্ত এড়িয়ে দ্রুত দাফন করা সম্ভব হয়। কিছু ক্ষেত্রে, চিকিৎসকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে বিক্ষোভসংশ্লিষ্ট নিহত ও আহতদের সংখ্যা নথিভুক্ত করা থেকে বিরত রাখা হয়। আবার কিছু ঘটনায় পুলিশ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিসহ মরদেহ নিয়ে যায়, তবে সেগুলো পরে মর্গে হস্তান্তর করা হয়েছিল কি না, কিংবা যথাযথভাবে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়।

৫৭. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বিশেষ করে বিক্ষোভসংক্রান্ত মৃত্যুর পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণ। নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্য ও উন্মুক্তভাবে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এনএসআই) সংস্থা ওএইচসিএইচআরকে ৩১৪ নিহতের নাম ও তাদের মৃত্যুর তারিখের তালিকা সরবরাহ করে। এনএসআই জানায়, তারা সবাই বিক্ষোভ চলাকালে নিহত হয়েছেন, তবে তাদের তথ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এদের মধ্যে চার থেকে ১৭ বছর বয়সী ৪০ জন শিশু-কিশোর রয়েছে (মোট নিহতের ১৩ শতাংশ)।

৫৮. আন্দোলনে নিহতের আরও নির্ভরযোগ্য হিসাব তৈরির জন্য ওএইচসিএইচআর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যের সঙ্গে নাগরিক বিভিন্ন সংগঠনসহ অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের বিশদ তালিকা মিলিয়ে দেখে এবং পুনরাবৃত্ত হওয়া তথ্য বাদ দেয়। বিশ্লেষণে উঠে আসে, ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা এক হাজার ৪০০ পর্যন্ত হতে পারে, যার মধ্যে অন্তত ১৩ জন নারী।

৫৯. দুঃখজনকভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যসহ মূল উপাত্তগুলো বয়সভিত্তিক ধারাবাহিকতায় সাজানো (বিভাজিত) নয়। তবে নিহতদের মধ্যে শিশু-কিশোরদের হার নিয়ে এনএসআইয়ের দেওয়া তথ্য (১৩ শতাংশ) একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে গোপনীয়ভাবে পাওয়া বিশদ একটি তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়। ওই সূত্রের হিসাব অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে ১২ শতাংশ শিশু-কিশোর, অর্থাৎ ৯৮৬টি নথিভুক্ত মৃত্যুর মধ্যে ১১৮ জন শিশু-কিশোর।

৬০. ওএইচসিএইচআর পৃথকভাবে প্রতিটি মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেনি এবং এসব মৃত্যুকে সরাসরি রাষ্ট্রের দায় বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বলে ধরে নেওয়া যায় না। তবে নিচে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ সম্ভবত আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি, যার মধ্যে সামরিক রাইফেল ও প্রাণঘাতী ধাতব ছররা ভর্তি শটগান অন্তর্ভুক্ত। এসব অস্ত্র সাধারণত শুধু বাংলাদেশের পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী ও সেনাবাহিনী ব্যবহার করে।

৬১. ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের তদন্তে ১৩০টি মৃত্যুর বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, মোট মৃত্যুর ৭৮ শতাংশই আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে হয়েছে। ওএইচসিএইচআর অনুমিত এক হাজার ৪০০টি মৃত্যুর মধ্যে গুলিতে মৃত্যু হাজারের বেশি হতে পারে। এসব মৃত্যু সাধারণত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহার করা অস্ত্রের মাধ্যমে ঘটেছে, যা সাধারণ নাগরিকদের কাছে সহজলভ্য নয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট মৃত্যুর ৬৬ শতাংশই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন স্বয়ংক্রিয় ও আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলিতে হয়েছে। এ ধরনের অস্ত্র সাধারণত বিজিবি, র‍্যাব, সেনাবাহিনী, আনসার/ভিডিপি ও সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়নের সদস্যদের দেওয়া হয়। বিক্ষোভ দমনে পুলিশও এসব অস্ত্র ব্যবহার করেছে। আরও ১২ শতাংশ মৃত্যু শটগানের গুলিতে হয়েছে। শটগানে এসব প্রাণঘাতী গুলিভর্তি (শিল্প মানদণ্ড অনুসারে 'নম্বর ৮ ধাতব গুলি') ছিল। এই অস্ত্র বাংলাদেশ পুলিশ ও আনসার/ভিডিপির সদস্যরাও ব্যবহার করেন। এই তথ্য আরও বড় পরিসরের একটি নির্ভরযোগ্য ও গোপনীয় সূত্রের তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়, যা নিশ্চিত করেছে যে অধিকাংশ মৃত্যু নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যবহৃত অস্ত্রের কারণেই হয়েছে।

BANGLA NEWS24.com

৬২. অধিকন্তু, এই পরিসংখ্যানগুলো ওএইচসিএইচআরের ফরেনসিক চিকিৎসক এবং অস্ত্র বিশেষজ্ঞ দ্বারা সংগৃহীত এবং বিশ্লেষণ করা অন্যান্য তথ্যের সাথে মিলে যায় যা দেখায় যে, গুলিবিদ্ধদের শরীরে যে গুলি পাওয়া গেছে, তা বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে তৈরি ৭ দশমিক ৬২×৩৯ মিলিমিটার আকারের সামরিক মানের গুলি। এই গুলি সাধারণত সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহার করে। কিছু ঘটনায় দেখা গেছে, নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর বিশেষ ধরনের বর্মভেদী (আর্মার-পিয়ার্সিং) ৭ দশমিক ৬২ মিলিমিটার ক্যালিবারের গুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের গুলি মূলত যুদ্ধক্ষেত্রে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরা প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে ব্যবহারের জন্য তৈরি। এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যবহার উপযোগী নয়। সাধারণ মানুষের কাছে এই গুলি পাওয়া সম্ভব নয়, এটি কেবল সেনাবাহিনী, বিজিবি ও র‍্যাবের মতো বাহিনীগুলোর জন্য বরাদ্দ থাকে।

৬৩. আন্দোলনের সময় ধারণ করা ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, আনসার/ভিডিপি ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা এসকেএস, টাইপ ৫৬ ও বিডি-৮ রাইফেল ব্যবহার করেন। এসব রাইফেল ৭ দশমিক ৬২ মিলিমিটার ক্যালিবারের গুলি চালায়, যা বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয়।

৬৪. আন্দোলন চলাকালে যেসব ক্ষেত্রে বেসামরিক লোকেরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন, সেসব ক্ষেত্রে তাদের হাতে পিস্তল, রিভলভার, সাবমেশিন গান, দেশীয় অস্ত্র এবং স্পোর্টিং শটগান দেখা যায়। কিছু ঘটনায়, বিশেষ করে আগস্টের শুরুর দিকে, কিছু ব্যক্তিকে ট্যাকটিক্যাল শটগান ও আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ব্যবহার করতেও দেখা যায়। তবে বেসামরিকদের ব্যবহৃত অস্ত্রের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল খুবই কম।

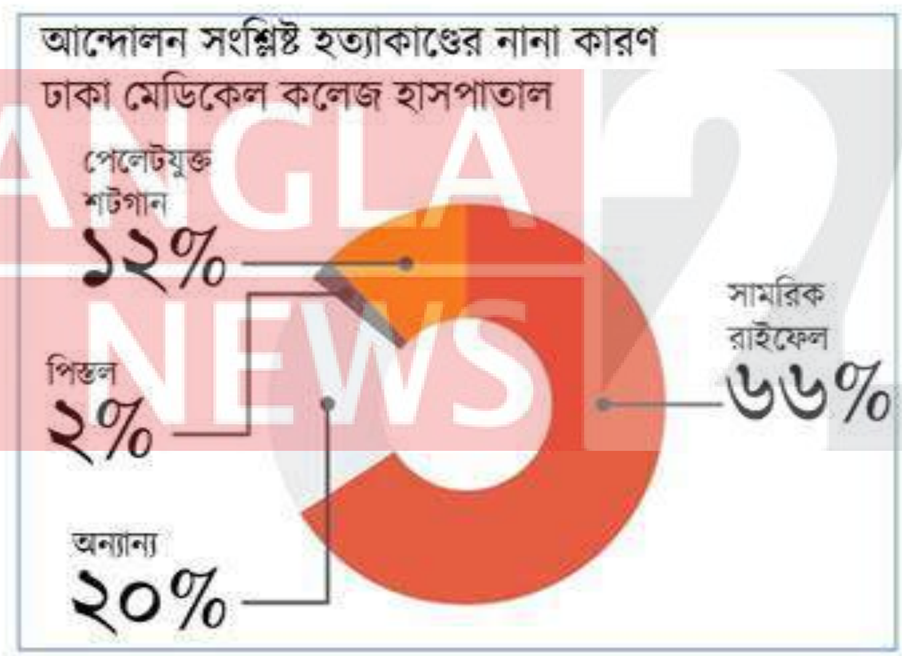

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের দেওয়া আন্দোলন সংশ্লিষ্ট ১৩০টি মৃত্যুর ফরেনসিক তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, তিন-চতুর্থাংশের বেশি মৃত্যু সরকারি বাহিনীর সাধারণত ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে হয়েছে। ছবির উৎস: ওএইচসিএইচআর

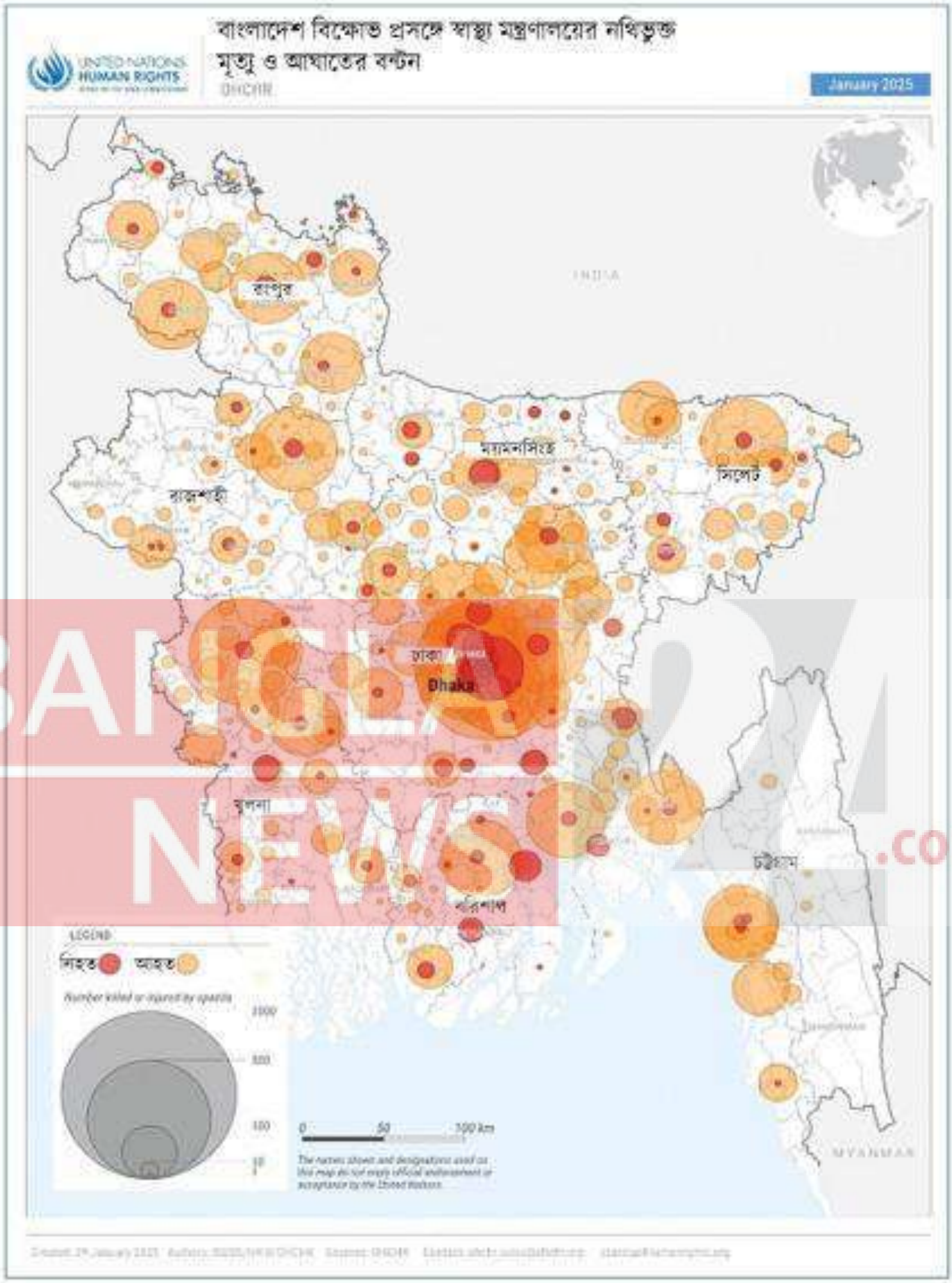

BANGLA NEWS 24 .com

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, আন্দোলন চলাকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে হতাহতের ঘটনা ঘটে।
ছবির উৎস: ওএইচসিএইচআর।

V . বিক্ষোভ চলাকালে লঙ্ঘন ও নির্যাতন

৬৫. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর জানায়, ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিগত সরকার, সরকারের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা এবং আওয়ামী লীগের সহিংস গোষ্ঠীগুলো একসঙ্গে পরিকল্পিতভাবে আন্দোলন দমাতে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন চালিয়েছে।

৬৬. প্রথম দিকে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আন্দোলন দমনে টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট, সাউন্ড ও স্টান গ্রেনেড এবং ধাতব গুলিভর্তি শটগান ব্যবহার করে। এসব অস্ত্রের ব্যবহারের ফলে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষার্থী আবু সাঈদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হুমকি হয়ে না দাঁড়ালেও শটগানের গুলিতে তাকে জীবন দিতে হয়। আন্দোলন আরও তীব্র হলে নিরাপত্তা বাহিনী আরও প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করে। তারা সামরিক রাইফেল ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী ও পথচারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়, এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হন।

৬৭. বিগত সরকার বিক্ষোভ দমনে ক্রমশ সামরিক কৌশল নিতে থাকে, যেখানে আধা সামরিক বাহিনী বিজিবি ও র‍্যাব পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় এবং অতিরিক্ত প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকারদের মধ্যে শিশুরাও ছিল। ওএইচসিএইচআর যে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ধরন ও মাত্রা নথিভুক্ত করেছে, তা থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা সংঘঠিত বহু হত্যাকাণ্ড ও আহত করার ঘটনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। জুলাইয়ের মধ্যভাগ থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে নিরাপত্তা বাহিনী শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং হাজারো মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী।

BANGLA NEWS 24 .com

৬৮. ওএইচসিএইচআরের তদন্ত করা অন্তত তিনটি ঘটনায় দেখেছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা কোনো ধরনের হুমকি সৃষ্টি না করা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালান এবং এর মধ্যে অন্তত এক ঘটনায় বিচারবহির্ভূত হত্যা করেছে। এ ছাড়া সেনাবাহিনী এমন অভিযানে সহযোগিতা করেছে, যেখানে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে।

৬৯. সশস্ত্র ছাত্রলীগ ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিসোঁটা, দা ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়, যা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের উসকানিতে ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে এসব হামলা পুলিশের সঙ্গে মিলিতভাবে করা হয়।

৭০. পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী যখন আন্দোলন দমনে সহিংস অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল, তখন আহত আন্দোলনকারীদের চিকিৎসা সহায়তা নিশ্চিত করা হয়নি, এমনকি চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতিও জানানো হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ও ভিডিও প্রমাণ অনুযায়ী, পুলিশ (গোয়েন্দা বিভাগসহ), গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই ও এনএসআই এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা সক্রিয়ভাবে

চিকিৎসাসেবায় বাধা দেন। তারা অ্যাম্বুলেন্স আটকে দেন, হাসপাতাল থেকে বিক্ষোভকারীদের তথ্য সংগ্রহ করেন, চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের গ্রেপ্তার করেন এবং চিকিৎসাকর্মীদের ভয় দেখান। ডিজিএফআই ও এনএসআইসহ গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি জব্দ করে এবং কর্মীদের মিথ্যা রিপোর্ট দিতে বা চিকিৎসা না দিতে বাধ্য করে। পরিকল্পিতভাবে দেওয়া এই বাধা আহতদের অবস্থা আরও গুরুতর করে এবং প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৭১. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে, পুলিশ (গোয়েন্দা বিভাগ ও র‍্যাবসহ) হাজার হাজার বিক্ষোভকারী, শিক্ষার্থী, বিরোধী দলের কর্মী, শ্রমিক এবং এমনকি শিশুদেরও বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার ও আটক করে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত ব্লক রেইড অভিযানে এই গ্রেপ্তার কর্মকাণ্ড চালানো হয়। আহতদের লক্ষ্য করে গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়, পাশাপাশি গোয়েন্দা বিভাগ, ডিজিএফআই, এনএসআই ও এনটিএমসি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেও আটক করা হয়। গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ ও ডিজিএফআই আটক ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতন চালায়, যার মধ্যে মারধর, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার হুমকি দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়, তথ্য সংগ্রহ ও ভিন্নমত দমন করার চেষ্টা করা হয়। বহু আটক ব্যক্তিকে, বিশেষ করে যাদের গণগ্রেপ্তারের মাধ্যমে ধরা হয়েছিল, তাদের আইনজীবীর সহায়তা থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং কোনো বিচারকের সামনে হাজির না করেই দীর্ঘ সময় আটক রাখা হয়।

৭২. ডিজিএফআই, এনএসআই, গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থা সাংবাদিকদের ভয় দেখিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, এনটিএমসি ও বিটিআরসি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়, যা একই উদ্দেশ্যে করা হয়। এই ইন্টারনেট বন্ধের সিদ্ধান্ত কোনো আইনি প্রক্রিয়া বা যথাযথ কারণ ছাড়াই কার্যকর করা হয়। এতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলন সংগঠিত করার প্রক্রিয়া বাধার মুখে পড়ে। পাশাপাশি মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় সহিংসতার প্রমাণ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি কঠিন হয়ে পড়ে। বিক্ষোভ চলাকালীন ছয়জন সাংবাদিক নিহত হন এবং অন্তত ২০০ জন আহত হন।

৭৩. নারী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা চালানো হয়, যার মধ্যে শারীরিক নির্যাতন, কিছু নথিভুক্ত ঘটনায় ধর্ষণের হুমকি এবং শারীরিক যৌন নিপীড়নও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব হামলা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কিছু নারীকে বেআইনিভাবে আটক, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়। মূলত, নারীদের ভয় দেখিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে রাখা এবং আন্দোলনে তাদের ভূমিকা দুর্বল করাই এসব সহিংসতার উদ্দেশ্য ছিল।

৭৪. শিশুরাও পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যা, বেআইনি গ্রেপ্তার, অমানবিক পরিবেশে আটকের শিকার হয়েছে এবং নির্যাতনসহ ইচ্ছাকৃত শারীরিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে।

BANGLA NEWS 24 .com

৭৫. প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সময়কালে সংঘটিত এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের একটি পরিকল্পিত ও বিস্তৃত দমননীতির প্রমাণ দেয়। এর মধ্যে বেআইনিভাবে শক্তি প্রয়োগ, চিকিৎসাসেবায় বাধা দেওয়া, বেআইনি গ্রেপ্তার, বিচারিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করা এবং কিছু ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না; বরং আন্দোলন দমন, জনগণকে ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক বিরোধীদের সংগঠিত হয়ে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বিষয়টিকে ঠেকানোর সুপরিকল্পিত কৌশলের অংশ ছিল।

১. সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উসকানিতে সহিংসতা

৭৬. শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনের লক্ষ্যে এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার লঙ্ঘন করে আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারা ছাত্রলীগের সহিংস সদস্য ও সমর্থকদের সশস্ত্র হামলার উসকানি দেন। অনেক ক্ষেত্রে, এসব হামলায় অন্যান্য আওয়ামী লীগ সমর্থকেরাও যুক্ত ছিলেন। কর্তৃপক্ষ (আইনশৃঙ্খলা বাহিনী) তাদের বাধা না দিয়ে বরং দায়মুক্তির সুযোগ দিয়ে সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেয়।

BANGLA NEWS 24 .com

৭৭. ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সরাসরি সাক্ষ্য, পাশাপাশি ছবি ও ভিডিও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর নিশ্চিত হতে পেরেছে, আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি বড় অংশ পুলিশসহ সমন্বিতভাবে বা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সহিংস হামলা চালিয়েছে। তারা ব্যাপক ও বেআইনি সহিংসতার মাধ্যমে আন্দোলন দমন করতে সরকারের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবং আশেপাশে ছাত্রলীগের হামলা

৭৮. ২০২৪ সালের ১৪ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত যখন আন্দোলন মূলত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কিংবা এর আশপাশে চলছিল, তখন ছাত্রলীগের সহিংস সদস্যরা কখনো নিজে, কখনো আওয়ামী লীগের অন্যান্য সমর্থকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিসোঁটা, ধারালো অস্ত্র এবং কিছু ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে হামলা চালায়।

৭৯. এই হামলাগুলো আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের উসকানিতে সংঘটিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ১৪ থেকে ১৫ জুলাই রাতের মধ্যে ধারালো ও ভোঁতা অস্ত্রধারী কিছু আওয়ামী লীগ সমর্থককে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয় এবং তারা ক্যাম্পাসের চারপাশে ভয়ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। প্রায় রাত ৩টার দিকে ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন রাজু ভাস্কর্যে সমবেত আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, ‘সোমবার (১৫ জুলাই) থেকে বাংলাদেশের রাস্তায় কোনো রাজাকার থাকবে না। এটি প্রতিটি জেলা, শহর, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতাদের জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা– যারা অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়, যারা শহীদদের অবমাননা করবে, তাদের রাস্তায়ই প্রতিহত করা হবে।’ ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও

বিগত সরকারের মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'শিক্ষার্থীরা অহংকারী হয়ে উঠেছে। আমরা ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত।' তিনি আরও বলেন, 'কোটা সংস্কার আন্দোলনের কয়েকজন নেতার বক্তব্যের জবাব দিতে ছাত্রলীগ প্রস্তুত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজাকার স্লোগান দেওয়া আমাদের জাতীয় অনুভূতির প্রতি স্পষ্ট ঔদ্ধত্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে যেকোনো অপশক্তিকে আমরা কঠোর হাতে প্রতিহত করব।' এর আগেই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী আন্দোলনকারীদের 'দেশদ্রোহী' বা 'রাজাকার' বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন, তাদের প্রতিবাদের কোনো অধিকার নেই। তখনকার প্রধানমন্ত্রী প্রথম এই শব্দ ব্যবহার করার পর, মন্ত্রীরা আরও সরাসরি ও উসকানিমূলক বক্তব্য দিতে থাকেন।

৮০. ওএইচসিএইচআরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কিছু সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা (মন্ত্রী) দাবি করেন, এসব শুধুমাত্র 'রাজনৈতিক বাগাড়ম্বর' ছিল। অন্যদিকে কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এসব মন্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেন। মন্ত্রিসভার সাবেক এক সদস্য বিশেষভাবে ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্যকে 'ভুল' বলে স্বীকার করেন এবং বলেন, 'এ ধরনের কথা বলা উচিত হয়নি'। ওএইচসিএইচআরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কোনো আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ নেতা বা মন্ত্রী এমন কোনো বক্তব্য বা নির্দেশনার কথা বলেননি, যেখানে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এসব মন্তব্য থেকে সরে এসেছে বা বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে। তারা এটাও স্বীকার করেননি যে, ছাত্রলীগ বা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সহিংসতা বন্ধের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিছু সাক্ষাৎকারদাতা স্বীকার করেছেন, আওয়ামী লীগ চাইলে সশস্ত্র সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারত– যেমন দলীয় কার্যালয় রক্ষার জন্য তাদের মোতায়েন করা। তবে, দলটি কোথাও তাদের সমর্থকদের সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানায়নি।

৮১. ওএইচসিএইচআর নিশ্চিত হয়েছে, আওয়ামী লীগ নেতাদের সহিংসতা উসকে দেওয়া বক্তব্যের পরপরই ছাত্রলীগের সদস্য ও সমর্থকরা সরাসরি ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর একাধিক হামলা চালায়। কিছু প্রত্যক্ষদর্শী হামলাকারীদের মধ্যে ছাত্রলীগের নেতা বা সদস্যদের শনাক্ত করেছেন। হামলাকারীরা প্রায়ই ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পর্কিত স্লোগান দিত। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, ভিডিও ও ছবি থেকে দেখা যায়, তারা অস্ত্র প্রদর্শন করেছিল, হেলমেট পরিহিত ছিল। তারা সংঘবদ্ধ কায়দায় সহিংসতা চালায়, যা ছাত্রলীগের আগের হামলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৮২. ছাত্রলীগ সমর্থকেরা নিয়মিতভাবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালাত। বেশিরভাগ সময় এটা পরিষ্কার ছিল যে, তারা হঠাৎ করে সহিংসতায় জড়ায়নি, বরং তারা আগেই অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা করতে আসতো। তবে অনেক সময় হামলাগুলো সহিংসতায় পরিণত হতো, কারণ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ইট, লাঠিসহ অন্যান্য সাময়িক অস্ত্র ব্যবহার করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীরা ছাত্রলীগের হামলাকারীদের চেয়ে সংখ্যায় এগিয়ে ছিলেন, যা তাদের জয়ী হতে সহায়তা করে। কিছু ক্ষেত্রে সংঘর্ষ শুরু হয় উভয়ের উসকানির কারণে, কিংবা যখন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আগের হামলার প্রতিশোধ নিতে সহিংস হয়ে ওঠেন।

৮৩. ১৪ জুলাই গভীর রাতে শিক্ষার্থীরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে

BANGLA NEWS 24.com

একটি মিছিল বের করেন। সেখানে তারা “চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার” বলে স্লোগান দেন। পরে রাতেই তাদের ওপর ছাত্রলীগ সমর্থকেরা লোহার রড ও কাঠের ডাল নিয়ে আক্রমণ চালায়। এতে বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী আহত হন। অনেক ছাত্রী অর্থাৎ নারী শিক্ষার্থীকে যৌন সহিংসতার হুমকি দেওয়া হয়। পরের রাতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের একটি বড় দল হেলমেট পরে এবং কুড়াল, ছুরি ও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ক্যাম্পাসে পৌঁছায়, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ সভা করছিলেন। তারা নিরাপত্তার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে চলে গেলে সেখানে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা বাসভবনের গেট বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের ভেতরে আটকে দেয়। এরপর তাদের দিকে ইট ও পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। ভয় পেয়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের কাছে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পুলিশ এসে পৌঁছালেও তারা সহিংসতা থামানোর কোনো চেষ্টা করেনি।

৮৪. ১৪ জুলাই দিনগত রাত ১টা ৩০ মিনিটের দিকে ছাত্রলীগ সমর্থকেরা ছুরি, লম্বা রড ও লাঠি নিয়ে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ওপর পূর্ব-পরিকল্পিত হামলা চালায়। অনেক শিক্ষার্থী আহত হন এবং দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরে ছাত্রলীগ সমর্থকেরা কিছু সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে শক্তি অর্জন করে আবারো ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়।

৮৫. ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। দুপুরের দিকে যখন আন্দোলনকারী কিছু শিক্ষার্থী একটি মিছিল নিয়ে বিজয় একাত্তর হলের দিকে অগ্রসর হন, তখন হলের সামনে প্রথম সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুই পক্ষের কথার লড়াই দ্রুত সংঘর্ষে রূপ নেয়। বিজয় একাত্তর হল থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ইট, পাথর ও বোতল ছোড়ে। আর বাইরে থাকা আন্দোলনকারীরাও পাল্টা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। কিছুক্ষণ পর, আন্দোলনকারীরা জিয়াউর রহমান হলে প্রবেশ করেন, যেখানে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাদের কয়েকজন সহযোদ্ধাকে আটক রেখেছিল। এদিকে, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বড় ধরনের হামলার প্রস্তুতি হিসেবে দা, কুড়াল, লাঠি, হেলমেট এবং কিছু আগ্নেয়াস্ত্রসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে কৌশলগতভাবে অবস্থান নেয়। হামলার আশঙ্কায় কিছু আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী লাঠি, পাইপ ও বাঁশের কাঠি নিয়ে প্রস্তুতি নেন। বিকেল ৩টার কিছু পর ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা হঠাৎ আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। অনেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে থাকলেও তারা হামলার শিকার হন। আন্দোলনকারী নারী শিক্ষার্থীদের লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়, তাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ বেরোনোর পথগুলোর সামনে ছাত্রলীগ সমর্থকরা অবস্থান নেওয়ায় আন্দোলনকারীরা পালানোর সুযোগ পাননি; আত্মরক্ষার জন্য তারা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিকেল সাড়ে ৩টার কিছু পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও তারা সংঘর্ষ থামাতে বা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে সহিংসতা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকে।

BANGLA NEWS 24 .com

ছবি ৩ ও ৪: ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলায় জড়িত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

ছবি সূত্র: অনুমতিসহ সংরক্ষিত, ওএইচসিএইচআরের ডিজিটাল ফরেনসিক টিম ছবিটি নিয়ে কাজ করেছে

৮৬. আহত অনেক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী এবং কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকর্মী চিকিৎসার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। সন্ধ্যার আগে শত শত ছাত্রলীগ নেতাকর্মী জোরপূর্বক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রবেশ করে। তাদের অনেকের হাতে অস্ত্র ছিল। তারা জরুরি বিভাগে হামলা চালায় এবং চিকিৎসা নিতে যাওয়া আহত আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও চিকিৎসাকর্মীদের ওপর আক্রমণ করে। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী নতুন করে আহত হন। এতে নতুন করে কারো হাড় ভাঙে, মাথায় আঘাত লাগে, কারো শরীরে গুরুতর জখম হয়। নারী শিক্ষার্থীরা মৌখিক ও শারীরিক হেনস্থার শিকার হন এবং কিছু ছাত্রলীগ সমর্থক প্রকাশ্যে তাদের যৌন সহিংসতার হুমকি দেয়। ১৬ জুলাই ছাত্র আন্দোলনকারীরা পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে সংঘর্ষের মাধ্যমে ছাত্রলীগ সমর্থকদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে বের করে দেন।

BANGLANEWS24.com

৮৭. ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে যোগ না দিতে হুমকি দেয়। ১৪ জুলাই যখন কিছু নারী শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনে যেতে চেয়েছিলেন, তখন ছাত্রলীগ সমর্থকরা তাদের ওপর গরম পানি ছুড়ে মারে এবং তাদের আহত করে। ১৫ জুলাই সকালে ইডেন কলেজের আরও কয়েকজন ছাত্রী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই প্রায় ৫০ জন নারী ও পুরুষ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর একটি দল তাদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগের কয়েকজন পুরুষ নেতাকর্মী নারী শিক্ষার্থীদের মারধর করে, লাথি মারে। আহতদের মধ্যে একজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়, কিন্তু সেখানেও তারা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হামলার শিকার হন।

৮৮. ১৬ জুলাই দুপুরে হাজারো শিক্ষার্থী সায়েন্সল্যাব এলাকার কাছে ঢাকা কলেজের সামনে বিক্ষোভে অংশ নেন। সেখানে আগেই প্রস্তুত থাকা ছাত্রলীগ নেতাকর্মী ও তাদের সহযোগীরা মাথায় হেলমেট পরে লাঠি, পাইপ, দা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু শিক্ষার্থীরাও ইট-পাটকেল এবং হাতে যা ছিল তাই দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং সংখ্যায় বেশি থাকায়

নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন। সংঘর্ষের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত আন্দোলনকারীদের ঢল নামে। অনেকেই গুরুতর আঘাত, গুলির ক্ষত ও ধারালো অস্ত্রের আঘাত নিয়ে ভর্তি হন। হাসপাতালে দুজনের মৃত্যু হয়, যাদের একজন ২৫ বছর বয়সী। বলা হচ্ছিল তিনি আওয়ামী লীগ সমর্থক।

১. সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থক ও পুলিশের সমন্বিত হামলা

৮৯. আন্দোলন চলতে থাকে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ক্রমশ সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দমন অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মধ্যে আওয়ামী যুবলীগের সদস্যরাও ছিল। যুবলীগ আওয়ামী লীগের যুব সংগঠন হিসেবে পরিচিত হলেও এতে বহু মধ্যবয়সী ব্যক্তি ছিলেন, যারা সহিংস কর্মকাণ্ডে জড়িত।

৯০. বিভিন্ন অভিযানে সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা পুলিশের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায় বা পুলিশের আড়ালে আশ্রয় নেয়। এরপর তারা পরিকল্পিতভাবে পুলিশের সহিংস দমন অভিযানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হামলা চালায়। অভ্যন্তরীণ একটি সূত্র জানায়, যাত্রাবাড়ী থানায় সশস্ত্র আওয়ামী লীগ নেতাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয়েছিল। এই সহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল পূর্ববর্তী সরকারের অধীনে পুলিশের রাজনৈতিকীকরণের ফলে, যা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও পুলিশের মধ্যে গভীর যোগসূত্র তৈরি করেছিল। পারস্পারিক এই সহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল বিগত সরকারের অধীনে পুলিশের রাজনৈতিকীকরণের ফলে, যা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও পুলিশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি করেছিল।

BANGLA NEWS 24 .com

৯১. ১৮ জুলাইয়ের পর বিশেষ করে আগস্টের শুরুর দিকে, যখন আন্দোলন আরও বিস্তৃত হয়, তখন সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বড় ধরনের হামলা চালায়, যার মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ঘটনাও ছিল। এ বিষয়ে বর্তমান পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ওএইচসিএইচআরকে জানান, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ সমর্থকদের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম হয় এবং তারা সেসব অস্ত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ব্যবহার করে। বাংলাদেশ পুলিশ ওএইচসিএইচআরকে ৯৫ জনের নাম ও তাদের ভূমিকার তালিকা সরবরাহ করেছে। পুলিশ মনে করে, আন্দোলনের সময় সহিংস হামলা চালানোর জন্য তারা অস্ত্র সরবরাহ করে। এর মধ্যে ১০ জন তখনকার সংসদ সদস্য, ১৪ জন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা, ১৬ জন যুবলীগ নেতা, ১৬ জন ছাত্রলীগ নেতা ও সাতজন পুলিশ সদস্য অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ আরও ১৬০ জন আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তার নাম ও তাদের ভূমিকার তালিকা দেয়, যাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে সহিংস হামলায় উসকানি দেওয়া বা নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৯২. আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মিলে এবং তাদের সহায়তায় আন্দোলন দমনে হামলা চালায়। কিছু হামলা পরিচালিত হয় আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা ও সরকারি কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে, যার মধ্যে সংসদ সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য, ভিডিও ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।

৯৩. ১৯ জুলাই আওয়ামী লীগ নেতাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালের কাছে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালায়। একই

দিনে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে কয়েকশ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী রায়েরবাগের মুজাহিদ নগর কেন্দ্রীয় মসজিদে হামলা চালায়। এই হামলায় দুই প্রবীণ ব্যক্তি নিহত হন। মসজিদে থাকা অন্যরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে সংঘর্ষ হয়, যেখানে প্রায় ৮০ জন আহত হন এবং তিনজন নিহত হন। এ ছাড়া ১৯ জুলাই যুবলীগ নেতাকর্মীরা পুলিশের সঙ্গে মিলে সংসদের সামনে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন ঠেকানোর চেষ্টা করে। তারা প্রতিবাদকারীদের মারধর করে, এমনকি প্রধান বক্তাকেও আক্রমণ করে।

৯৪. ২ আগস্ট উত্তরায় আন্দোলন দমন অভিযানে পুলিশের সঙ্গে মিলে সশস্ত্র যুবলীগ নেতাকর্মীরা মাইলস্টোন কলেজের সামনে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। ভুক্তভোগীদের মধ্যে কয়েকজন নারীকে লোহার রড ও পিস্তল দিয়ে আঘাত করা হয়।

৯৫. ৩ আগস্ট কুমিল্লায় আগ্নেয়াস্ত্র, দা ও লোহার রড হাতে সশস্ত্র ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা প্রায় ৬০ জনের দল গঠন করে সংঘবদ্ধভাবে নারী-পুরুষ আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। এতে অসংখ্য আন্দোলনকারী আহত হন, আর সাতজন গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশ কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। পরদিন সশস্ত্র আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা একই ধরনের হামলা চালায় এবং আশপাশের ভবন থেকেও গুলি ছোড়ে।

BANGLA NEWS24.com

৯৬. ৪ আগস্ট সাভারের আশুলিয়ায় আগ্নেয়াস্ত্রসহ সশস্ত্র পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর প্রাণঘাতী গুলি চালায়। হামলাকারীদের মধ্যে একজন সংসদ সদস্যও ছিলেন। এতে তিন শিশু ও চার পুরুষ গুলিবিদ্ধ হন। একই দিন আরেকজন সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে সশস্ত্র আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা পুলিশের সঙ্গে মিলে সমন্বিতভাবে হামলা চালায়। তারা মিরপুরে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, এমনকি আশপাশের ভবন থেকেও প্রাণঘাতী গুলি ছোড়ে।

৯৭. ৫ আগস্ট খুলনা জেলায় এক স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি থেকে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানো হয়। এতে ওএইচসিএইচআরকে সাক্ষাৎকার দেওয়া এক ব্যক্তিসহ মোট ১৭ জন গুলিবিদ্ধ হন।

২. পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির বলপ্রয়োগ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৯৮. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআরের এটা বিশ্বাস করার উপযুক্ত কারণ রয়েছে যে, পুলিশ ও আধা সামরিক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী তখন আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করে। এর মধ্যে দমন-পীড়নের সমন্বিত কৌশলের অংশ হিসেবে পরিকল্পিত ও ব্যাপক বিচারবহির্ভূত হত্যাও অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ধারা অনুযায়ী, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনী শুধুমাত্র ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যবহার করতে পারে, যা বৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক হতে হয়। তাদের এমন পরিস্থিতি শান্ত করারও চেষ্টা করতে হয়, যা সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতে সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করা যেতে পারে– যদি তা আর শান্তিপূর্ণ না থাকে কিংবা যদি গুরুতর সহিংসতার আশঙ্কা থাকে, যা গ্রেপ্তারের মতো কম কঠোর

উপায়ে ঠেকানো সম্ভব না হয়। যদি কোনো শান্তিপূর্ণ সমাবেশ দীর্ঘ সময় ধরে রাস্তা বন্ধ করে বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করে, শুধু তখনই সেটি ছত্রভঙ্গ করা যায়, যখন বিঘ্নটি গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। যদি কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে, তবে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানো আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে এমন কোনো শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়, যা তাদের গুরুতর আহত করতে পারে। টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেডের মতো বিস্তৃত অঞ্চলে প্রভাব ফেলা এমন অন্যান্য অস্ত্র শুধু তখনই ব্যবহার করা উচিত, যখন প্রতিবাদকারীদের মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয় এবং তাদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেওয়া হয়। টিয়ার গ্যাস সংকীর্ণ জায়গায় ব্যবহার করা উচিত নয়। সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে কখনোই অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। সমাবেশে পুলিশিং করার সময় কখনোই আক্রমণাত্মকভাবে গুলি চালানো আইনসিদ্ধ নয়। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা সমাবেশের মধ্যে গুলি ব্যবহার করতে পারেন শুধু সেই অবস্থায় যখন এটি একেবারে প্রয়োজনীয় এবং শুধু তাদের লক্ষ্য করা উচিত যারা প্রাণনাশ বা গুরুতর আঘাতের অনিবার্য হুমকি সৃষ্টি করেন। কর্মকর্তারা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করতে পারেন, শুধু যদি তা জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়। ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি যে শক্তি ও অস্ত্র ব্যবহার করে, তা এই আইনি নীতিগুলো উপেক্ষা করে যায়। এর ফলে মানুষের জীবন এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

৯৯. আন্দোলনকারীরা কৌশলগতভাবে ব্লকেড, শাটডাউনের মতো কর্মসূচি দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন, বিশেষ করে ১৮ জুলাই থেকে। আন্দোলনকারীদের কিছু সদস্য সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হন, তাদের লক্ষ্য ছিল সরকারি ভবন, পরিবহন ব্যবস্থা ও পুলিশ। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কিছু ক্ষেত্রে সঠিক ও মানানসই শক্তি প্রয়োগের জন্য যুক্তিসঙ্গত হতে পারতো। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী সেই পন্থা অনুসরণ করেনি। ঢাকার প্রধান প্রধান আন্দোলনস্থলসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের তথ্য, ভিডিও, ছবি, মেডিকেল ফরেনসিকস ও অস্ত্রের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে ওএইচসিএইচআর এই উপসংহারে পৌঁছায় যে নিরাপত্তা বাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত বল প্রয়োগের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। কিছু পরিস্থিতিতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার দমনের জন্য সরাসরি অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে। কিছু ক্ষেত্রে তারা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে অত্যধিক শক্তি ব্যবহার করে, বিশেষত বিপজ্জনক ধাতব পিলেটযুক্ত বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়ে। যদিও সমাবেশে আন্দোলনকারীরা শান্তিপূর্ণ ছিলেন। নিরাপত্তা বাহিনী বারবার এমন লোকেদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে, যারা দাঙ্গা বা ভাঙচুরে জড়িত ছিলেন, কিন্তু তারা কোনো ধরনের হত্যা বা গুরুতর আঘাতের হুমকি তৈরি করেননি। তারা নির্বিচারে গুলি চালায় মিশ্র জনতার ভিড়ের দিকে। এই ভিড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী, ভাঙচুরকারী, সহিংস দাঙ্গা সৃষ্টিকারী ও সাধারণ মানুষও ছিলেন। আর সেসব ক্ষেত্রেই বেশি প্রাণহানি ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ওএইচসিএইচআর নথিভুক্ত করেছে, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী সরাসরি গুলি করে নিরপরাধ আন্দোলনকারীদের হত্যা বা আহত করেছে।

BANGLA NEWS 24 .com

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার দমনে বেআইনি বলপ্রয়োগ, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার

১০০. শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার দমনে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কম প্রাণঘাতী অস্ত্রসহ প্রাণঘাতী গুলিভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়। আন্দোলন চলাকালে কিছু ক্ষেত্রে কম প্রাণঘাতী অস্ত্র এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যা গুরুতর আঘাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেমন সঙ্কুচিত জায়গায় টিয়ার গ্যাস ছোড়া বা জনতার ভিড়ের মধ্যে সাউন্ড গ্রেনেড ফাটানো। অনেক ক্ষেত্রেই সহিংসতা বাড়ছিল। নিরাপত্তা বাহিনী সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বলপ্রয়োগ করেছিল, যারা নিজেদের রক্ষায় ইট, লাঠি এবং হাতে তৈরি সাময়িক বা অস্থায়ী অস্ত্র ব্যবহার করছিলেন। নিরাপত্তা বাহিনী আরও বড় পরিসরে অবৈধভাবে বলপ্রয়োগ ব্যবহার করতে থাকে। তারা কম ক্ষতিকর অস্ত্র থেকে ক্ষতিকর গুলিভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের দিকে যায় কিংবা গুলিবর্ষণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়।

১০১. ওএইচসিএইচআর এমন কিছু ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যেখানে একক কোনো আন্দোলনকারীকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়, যদিও তারা কোনো হুমকি সৃষ্টি করেননি। ১৬ জুলাই ঘটে যাওয়া আবু সাঈদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একটি বিশেষ উদাহরণ।

BANGLA NEWS 24 .com

ঘটনা - ১: ১৬ জুলাই রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু সাঈদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

২৩ বছর বয়সী আবু সাঈদ ছিলেন পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সবার ছোট। পরিবারের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি কোটা বিরুদ্ধে আন্দোলনের শুরু থেকেই অংশ নিয়েছিলেন।

১৬ জুলাই রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে হাজার হাজার স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (পুলিশের হিসাব অনুযায়ী তিন-চার হাজার শিক্ষার্থী) প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নম্বর গেটে শিক্ষার্থীরা সমবেত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। পুলিশের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যখন আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট দিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করেন, তখন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ 'আন্দোলনরত শিক্ষার্থীসহ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে গ্যাস শেল ও ফাঁকা গুলি ছোড়ে'। পুলিশ আরও জানায়, আবু সাঈদ গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান এবং তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে 'মাথায় আঘাত ও গুলির আঘাত' উল্লেখ করা হয়।

ভুক্তভোগী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের নির্ভরযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ এবং প্রাপ্ত ভিডিওগুলো বিশ্লেষণে ওএইচসিএইচআর নিশ্চিতভাবে মনে করে যে, তার হত্যাকাণ্ডে পুলিশ সরাসরি জড়িত এবং দায়ী। ছাত্রলীগ সমর্থকদের সঙ্গে মিলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠি ও ব্যাটন নিয়ে হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, আবু সাঈদও হামলার শিকার হন। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ছোড়ে এবং ধাতব গুলিভর্তি শটগান ব্যবহার করে। এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন, একজন আংশিকভাবে দৃষ্টিশক্তি হারান। যখন পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালানো শুরু করে, আবু সাঈদ দুই হাত তুলে দেন। ভিডিও ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য অনুযায়ী, তিনি এক হাতে বাঁশের লাঠি ধরেছিলেন, তবে ১৪-১৫ মিটার দূরে অবস্থান করা পুলিশ সদস্যদের জন্য তিনি কোনোভাবেই হুমকি ছিলেন না। ওএইচসিএইচআরকে সাক্ষাৎকার দেওয়া প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য অনুযায়ী, আবু সাঈদ পুলিশকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলছিলেন, 'আমাকে গুলি করুন', তখন দুই পুলিশ সদস্য প্রাণঘাতী ধাতব গুলিভর্তি শটগান দিয়ে তার ধড় লক্ষ্য করে একাধিকবার গুলি চালায়। ওএইচসিএইচআর গুলি চালানোর ভিডিও ও ছবি পর্যালোচনা করে। এসব ছবি ও ভিডিও প্রথমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে এসব ছবি ও ভিডিওর মানোন্নয়নের কাজ করে ওএইচসিএইচআরের ডিজিটাল ফরেনসিক। এরপর তারা প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গে ছবি ও ভিডিও মিলিয়ে দেখে এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করে।

৫ নম্বর ছবিতে দেখা যায়, আবু সাঈদ হাত প্রসারিত করেছিলেন এবং কোনো হুমকি সৃষ্টি করেননি, তবু পুলিশ তাকে গুলি করে।

ভিডিও থেকে নেওয়া ৬ নম্বর ছবিতে দেখা যায়, অন্তত দুইজন ভিন্ন পুলিশ সদস্য আবু সাঈদের ওপর গুলি চালায়।

BANGLA NEWS 24 .com

ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ অনুযায়ী ৭ নম্বর ছবিতে দেখা যায়, পুলিশ ও আবু সাঈদের মধ্যে দূরত্ব ছিল আনুমানিক ১৪ থেকে ১৫ মিটার/
ছবি সূত্র: গুগল আর্থ, ওএইচসিএইচআরের ডিজিটাল ফরেনসিকস ছবির মানোন্নয়ন করেছে

৮ নম্বর ছবিতে তার গলায় লাল দাগ এবং শার্টে রক্তের দাগের মতো চিহ্ন দেখা যায়।

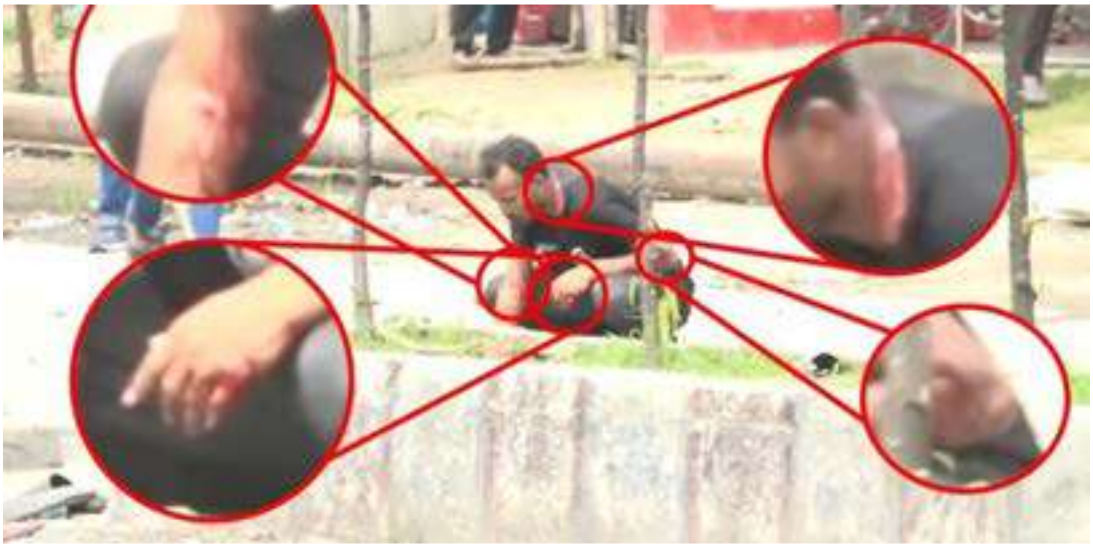

৯ নম্বর ছবিতে তার হাত, বাহু, কনুই এবং গলাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।

১০ নম্বর ছবিতে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আবু সাঈদ রক্তের মতো কিছু থুথু ফেলে দিচ্ছেন।
এটি চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে বলা হয়, গুলি তার গলা
ও ফুসফুস ভেদ করে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করেছিল

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, আবু সাঈদকে হাসপাতালে নেওয়া হলে একজন চিকিৎসক মূল্যায়ন করেন, ধাতব গুলির টুকরোগুলো তার ফুসফুসে প্রবেশ করে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করতে পারে।

ওএইচসিএইচআরের ফরেনসিক চিকিৎসক আবু সাঈদের মামলার মেডিকেল রেকর্ড পরীক্ষা করেছেন। তাতে তিনি দেখতে পেয়েছেন, আন্তর্জাতিক ফরেনসিক মান অনুযায়ী তার (আবু সাঈদ) ময়নাতদন্ত করা হয়নি। চিকিৎসক মরদেহের ছবিসহ চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রমাণ পর্যালোচনা করে শরীরে শটগানের গুলির ক্ষত শনাক্ত করেন। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, তলপেটসহ তার বুকের ডান পাশে ৪০টি ধাতব প্যালেট এবং বাঁ পাশে ৫০টি ধাতব প্যালেটের আঘাত ছিল। ফরেনসিক বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, আবু সাঈদকে প্রায় ১৪ মিটার দূর থেকে প্রাণঘাতী ধাতব প্যালেটস ভর্তি শটগান দিয়ে অন্তত দুবার গুলি করা হয়েছিল। ভিডিও ফুটেজের ফরেনসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর আবু সাঈদের গলা, বুক ও হাত থেকে রক্তক্ষরণ হয়। এরপর তার মধ্যে হাইপোভোলেমিয়া (রক্ত ও শরীরের অন্যান্য তরলের শূন্যতা) ও মাথা ঘোরার লক্ষণ দেখা যায়। বিশ্লেষণে মাথায় কোনো গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যা মৃত্যুর বিকল্প কারণকে সমর্থন করে। যেমন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় আবু সাঈদের মাথা মাটি বা অন্য কিছুর সঙ্গে জোরে আঘাত পেয়েছিল। যথাযথ ময়নাতদন্ত না হওয়া সত্ত্বেও নথিভুক্ত ক্ষত ও সংশ্লিষ্ট ভিডিও ফুটেজ এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে যে কমপক্ষে দুবার গুলির ফলে প্রাণঘাতী মেটাল প্যালেটের আঘাতে আবু সাঈদের মৃত্যু হয়েছে।

বিশ্লেষণ করা তথ্যের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআরের এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে যে, আবু সাঈদ পুলিশের ইচ্ছাকৃত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

মারাত্মক গোলাবারুদ ভর্তি শটগানের ধারাবাহিক ও নির্বিচার ব্যবহার

রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আবু সাঈদের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এটি ছিল বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ প্রবণতার প্রতিচিত্র। আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ধারাবাহিকভাবে স্বল্প-ব্যারেলের স্টকবিহীন শটগান ব্যবহার করেছে। যেগুলো তৈরি হয়েছিল প্রাণঘাতী ধাতব ছররা গুলি দিয়ে। পুলিশ বন্দুক লোড করে বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি করেছে।

জননিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ ধরনের গোলাবারুদযুক্ত শটগান ব্যবহারের ঘটনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থি। ধাতব ছররার বিস্তৃত ব্যাসার্ধের কারণে এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার প্রকৃতিগতভাবে নির্বিচার হয়ে যায়। বিশেষ করে তখন, যখন এটি জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় ব্যবহৃত হয়। এগুলো স্বল্প প্রাণঘাতী অস্ত্রের আওতায় পড়ে না। কেননা, ছররা গুলি সহজেই মানবদেহে প্রবেশ করে। অনেক সময় এটি প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। এসব গুলি অন্ধত্ব সৃষ্টি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি গুরুতর শারীরিক ক্ষতির কারণও হতে পারে।

ওএইচসিএইচআরের সংগৃহীত চিকিৎসা সংক্রান্ত ফরেনসিক তথ্য অনুসারে, বিক্ষোভের সময় নিহতদের মধ্যে প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ শটগানের ধাতব ছররার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। হাজারো মানুষ গুরুতর আঘাত পেয়েছেন, ফলে তাদের অনেকের শরীরে আজীবনের জন্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ভুক্তভোগী ধাতব ছররার আঘাতে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন বা মারাত্মক চোখের আঘাত পেয়েছেন। শুধু ঢাকার জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালেই আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ৭৩৬ জন চোখের আঘাত নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫০৪ জনের চোখে জরুরি অস্ত্রোপচার করতে হয়। সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধাতব ছররার আঘাতে আহত ৬৪ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ৩৬ জনের চোখে গুরুতর আঘাত ছিল।

BANGLA NEWS 24.com

ভুক্তভোগীদের এক্স-রে। ১১ ও ১২ নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে যারা পুলিশের শটগান থেকে ছোড়া ছররা গুলিতে চোখ, মাথা ও ধড়ে আঘাত পেয়েছেন।

বাংলাদেশে জননিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় শটগান একটি স্ট্যান্ডার্ড অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। পুলিশের এসব অস্ত্র সাধারণত ২ থেকে ৩ মিলিমিটার আকারের ধাতব ছররাযুক্ত গোলা বহন করে। এসব গুলির প্রতি কার্তুজে ২০০টি ধাতব ছররা থাকতে পারে। কিছু কিছু কার্তুজ অপেক্ষাকৃত কম প্রাণঘাতী ছয় থেকে আটটি বড় রাবার বুলেটযুক্ত গোলাবারুদ বহন করে। ২০২২ ও ২০২৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে পুলিশ ৩০ লাখেরও বেশি ধাতব ছররা কেনে। এটি একই সময় কেনা রাবার বুলেটের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। এমন কর্মকাণ্ড স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়, পুলিশ ব্যাপকহারে প্রাণঘাতী ধাতব

ছররার ওপর নির্ভর করেছে ও এর ব্যাপক ব্যবহার করেছে।

সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর কাছে ধাতব ছররাযুক্ত শটগানকে প্রাণঘাতী অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয় না। তাই অপেক্ষাকৃত কম প্রাণঘাতী অস্ত্র কার্যকর না হলে, এটি বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ও সম্পদের ভাঙচুর রোধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বরত সাধারণ পুলিশ কর্মকর্তাদের ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে। তারা সিদ্ধান্ত নেন কখন ছররা গুলি ছোড়া হবে আবার কখন রাবার বুলেট ব্যবহার করা হবে।

এমন অতিরিক্ত শিথিল নীতির সুযোগ নিয়ে পুলিশ নিয়মিত শটগান থেকে গুলি ছুড়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করা, সম্পদের ক্ষতি ঠেকানো ও আন্দোলনরতদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। কিছু ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক শক্তি প্রয়োগ করে প্রথমে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করার কথা পুলিশ সরাসরি প্রাণঘাতী ধাতব ছররা নিক্ষেপ করেছে।

ভিডিও বিশ্লেষণে দেখা যায়, পুলিশ দ্রুতগতিতে একের পর এক শটগানের গুলি ছুড়েছে, যা কাছাকাছি ভিড়ে থাকা মানুষের বুকে ও মাথার উচ্চতায় সরাসরি তাক করে চালানো হয়েছে। আবার, দূরের ভিড় লক্ষ্য করে কিছুটা উঁচু কোণে গুলি ছোড়া হয়। যাতে ধাতব ছররা দূর থেকেও মানুষকে আঘাত করতে পারে। এই কৌশল শটগানের প্রাণঘাতী ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মারাত্মক ক্ষতি ও অন্ধত্বের ঝুঁকি বাড়ায়। ওএইচসিএইচআরের কাছে থাকা ফরেনসিক চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যেও দেখা গেছে, ধাতব ছররার আঘাতে আহতদের বেশিরভাগই বুকে ও মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

১০২. সহিংস অস্থিরতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগেই সাবেক সরকারের নির্দেশে শান্তিপূর্ণ সমাবেশগুলো দমন করতে পুলিশকে বে-আইনি বলপ্রয়োগের আদেশ দেওয়া হয়। এর অন্যতম স্পষ্ট উদাহরণ হলো–১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বৃহৎ ছাত্র বিক্ষোভে সহিংস দমনপীড়ন।

BANGLA NEWS 24 .com

ঘটনা ২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ দমন (১৭ জুলাই)

১৭ জুলাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করেন, যার শুরুতে ১৬ জুলাই নিহত আবু সাঈদসহ অন্যান্যদের জন্য জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিক্ষোভ দমনে পুলিশের নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাব ও বিজিবির সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়, যারা রাইফেলসহ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থান নেওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যরা জোরপূর্বক বহিরাগতদের বিক্ষোভে যোগ দিতে বাধা দেন। এ সময় আওয়ামী লীগ সমর্থকরা বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের মারধর ও আটক করে এবং পরে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয়, যার ফলে অনেকে গ্রেপ্তার হন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ শুরুর সময় নিরাপত্তা বাহিনী কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। তবে দুপুরের দিকে, যখন শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের দিকে মিছিল করার চেষ্টা করেন তখন পুলিশ ও বিজিবি তাদের ঘিরে ফেলে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে, রাবার বুলেট ছোড়ে এবং লাঠিচার্জ করে। উপস্থিত সাংবাদিকদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রায় ৪০ মিনিটের মধ্যে পুলিশ প্রায় ১০০ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ফলে অনেক শিক্ষার্থী চোখ, গলা ও ত্বকে জ্বালাপোড়া অনুভব করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। একজন ছাত্রী জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনকে (ওএইচসিএইচআর) জানান, তিনি বসেছিলেন এবং পরিস্থিতির চাপে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, তখন কয়েকজন পুলিশ সদস্য তার কাছে এসে তাকে লাথি মারে, চড় দেয় এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এই বিক্ষোভ দমন অভিযানের নির্দেশ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমান্ড থেকে আসে এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পুরো অভিযানের বিষয়ে অবগত ছিলেন।

BANGLANEWS24.com

১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভের সময়ে তোলা ছবি ১৩-১৬

যদিও পরে বিক্ষোভকারীরা তাৎক্ষণিক কোনো হুমকি সৃষ্টি করেননি। বরং সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তারা ওএইচসিএইচআরকে জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারীদের রাজু ভাস্কর্যে পৌঁছানোর আগেই জোরপূর্বক ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে সামগ্রিকভাবে আন্দোলন আরও বড় রাজনৈতিক মাত্রা না পায়।

১০৩. ১৮ জুলাই থেকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বহু বিক্ষোভকারী প্রধান প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেন। পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি বিক্ষোভ দমন কার্যক্রম আরও তীব্র করে। তারা সামরিক রাইফেল দিয়ে গুলি চালানোর পাশাপাশি ধাতব গুলি ভর্তি শটগান ও অপেক্ষাকৃত কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন বিভিন্ন ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনার ভিত্তিতে এবং যাচাই করা ছবি, ভিডিও, চিকিৎসা প্রতিবেদনের ফরেনসিক বিশ্লেষণ ও অস্ত্র পরীক্ষার মাধ্যমে একাধিক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও অবৈধ বলপ্রয়োগের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। এর মধ্যে উত্তরায় মীর মুগ্ধ ও অন্যান্যদের হত্যার ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঘটনা ৩: উত্তরায় পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি কর্তৃক বিক্ষোভকারীদের বিচারবহির্ভূত হত্যা (১৮ জুলাই)

ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, উত্তরার বিভিন্ন স্থানে–বিএনএস সেন্টার, আজমপুর, উত্তরা পূর্ব থানা ও মাইলস্টোন কলেজ এলাকায়–নিরাপত্তা বাহিনী শিক্ষার্থী ও অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করে। ১৮ জুলাই সকালে পুলিশের সঙ্গে র‍্যাব, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, বিজিবি, আনসার ও সরকারি দলের সশস্ত্র সমর্থকরা উত্তরার বিএনএস সেন্টারে অবস্থান নেয়, কারণ সেদিন সকালে সেখানে বড় ধরনের বিক্ষোভের পূর্বাভাস ছিল। বেলা ১১টা ৩০ মিনিটের দিকে পুলিশ ও র‍্যাব টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, পরিস্থিতি ছিল 'ধোঁয়া ও শব্দের সম্মিলিত বিস্ফোরণ'। ওএইচসিএইচআর একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য পেয়েছে; যেখানে বলা হয়েছে, পুলিশের একটি সাঁজোয়া গাড়ি বিক্ষোভকারীদের দিকে ধেয়ে যায় এবং সেই গাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়।

বিকেলের দিকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পুলিশ ও র‍্যাবকে বিভিন্ন স্থান থেকে বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী গুলি চালাতে দেখা গেছে। কিছু ছবি ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী, উত্তরা পূর্ব থানার ছাদ থেকেও পুলিশ গুলি চালায়। শতাধিক বিক্ষোভকারী গুলিবিদ্ধ হন এবং কয়েকজন নিহত হন। একটি কাছের হাসপাতালে সেদিন ৯১ জন আহত ও ছয়জন নিহতের তথ্য নথিভুক্ত করা হয়, যার মধ্যে পাঁচজন ছিলেন শিক্ষার্থী। ওএইচসিএইচআরের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে, ভুক্তভোগীরা সাধারণত পুলিশ ও র‍্যাব ব্যবহৃত প্রাণঘাতী গুলিতে আহত বা নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ২৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ, যিনি বিক্ষোভকারীদের মাঝে পানি বিতরণ করছিলেন। বিকেলের শেষ দিকে তিনি পুলিশের রাইফেলের গুলিতে মাথায় আঘাত পান এবং ঘটনাস্থলেই নিহত হন। ওএইচসিএইচআর কর্তৃক যাচাই করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, সন্ধ্যা ৪টা ৫০ মিনিটে উত্তরা রবীন্দ্র সরণি সড়কে তিনি গুলিবিদ্ধ হন।

BANGLA NEWS 24.com

একই এলাকায় একই সময়ে আরেক বিক্ষোভকারীও মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। তিনি বেঁচে গেলেও গুরুতর ও স্থায়ী শারীরিক ক্ষতির শিকার হন। প্রথমে একটি সাউন্ড গ্রেনেড তার গায়ে বিস্ফোরিত হয়, এরপর একটি ধাতব গুলি তার মাথার পেছনে লাগে এবং পরে দুটি রাইফেলের গুলি তার মুখে বিদ্ধ হয়–একটি তার ভ্রূর ওপর দিয়ে ঢোকে, অন্যটি নাকের পাশে প্রবেশ করে মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আঘাতের কারণে তার ডান কানের ৯৫ শতাংশ শ্রবণশক্তি হ্রাস পেয়েছে। ভুক্তভোগীর মাথার হাড়েও স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি হয়। এতে স্নায়ুতন্ত্রের অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হয়েছে।

ওএইচসিএইচআর আরও অনেক শিক্ষার্থীর সরাসরি সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছে, যারা চোখ, পেট, পিঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাত পেয়েছেন। এক শিক্ষার্থী দুইবার গুলিবিদ্ধ হন, যার ফলে তার উরুর ওপরের অংশে ৪২টি গুলি লেগেছে। একটি গুলি তার ত্বকের এতটাই ভেতরে প্রবেশ করেছে যে, ওএইচসিএইচআরকে সাক্ষাৎকার দেওয়া সময়ও তিনি সেটি শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছিলেন। ফরেনসিক পর্যালোচনায় নিশ্চিত হয়েছে যে, ভুক্তভোগীদের ক্ষতগুলো ছিল ৮ নম্বর ধাতব গুলির কারণে, যা সাধারণত শটগান থেকে ছোড়া হয়। এক শিক্ষার্থী উত্তরা পূর্ব থানার কাছে পুলিশের গুলিতে চোখে আঘাত পান। তিনি বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম, পুলিশ আমার মাথায় গুলি করেছে, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি কল্পনাও করিনি, তারা আমার চোখে গুলি করেছে।' এই আঘাতে ভুক্তভোগীর রেটিনা, লেন্স ও কর্নিয়া মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর এক শিক্ষার্থী বিকেল সাড়ে পাঁচটায় পুলিশের গুলিতে দুবার আঘাত পান। প্রথম গুলিটি তার ডান হাতে বিদ্ধ হয়, দ্বিতীয়টি তার পেটে লাগে। তিনি বলেন, "আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল আর হয়তো বাড়ি ফিরে যেতে পারব না।" ওএইচসিএইচআরের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণে নিশ্চিত হয়েছে যে, তার হাতের ক্ষত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাইফেলের গুলির কারণে হয়েছে।

ছবি ১৭: *দুপুর ১:০০টায় তোলা, যেখানে দেখা যায় একজন ব্যক্তি উত্তরা পূর্ব থানার ছাদ থেকে টিয়ার গ্যাস ছুড়ছেন।*

ছবি ১৮: বিকেল ৫:৩৩টায় তোলা, যেখানে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা এগিয়ে আসছে, আর পুলিশ উত্তরা পূর্ব থানার ছাদে অবস্থান করছে এবং মহাসড়কে ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবি ক্রেডিট: ওএইচসিএইচআরের ডিজিটাল ফরেনসিকস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

BANGLA NEWS 24 .com

১০৪. জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন আরও বেশ কিছু ঘটনার নথিভুক্ত করেছে, যেখানে দেখা যায় নিরাপত্তা বাহিনী এমন বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী গুলি চালিয়েছে, যারা কোনো তাৎক্ষণিক হুমকি সৃষ্টি করছিল না। কিছু ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে আহত ও অক্ষম হয়ে পড়া বিক্ষোভকারীদের গুলি চালিয়ে হত্যা করে, যার মধ্যে শিশুরাও ছিল।

১০৫. সাভারে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কেউ কেউ লাঠি বহন করছিলেন, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় অবরোধের চেষ্টা করছিলেন। সড়ক অবরোধ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে পুলিশ, বিজিবির সহায়তায় আগেভাগেই সেখানে অবস্থান নেয়। সরকারি দল আওয়ামী লীগের সমর্থকেরাও সেখানে উপস্থিত ছিল, যাদের হাতে ছিল দা, লাঠি ও শটগান। স্থানীয় দলীয় নেতাদের মধ্যে একজনের হাতে ছিল পিস্তল-ক্যালিবার সাবমেশিন গান, যা সাধারণত রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। প্রাথমিকভাবে, পুলিশ টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট এবং শূন্যে গুলি ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে, আর আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা পুলিশের পক্ষ নিয়ে বিক্ষোভকারীদের আক্রমণ করে। দুপুরের পর বিক্ষোভকারীরা আশপাশের প্রধান সড়ক ও গলিতে পুনরায় সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন। ভিডিও ও একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্যমতে, পুলিশ শটগান থেকে ধাতব গুলি ছোড়ে, যা সরাসরি প্রাণঘাতী ছিল। এতে অনেক বিক্ষোভকারী গুরুতর আহত

১৯ ও ২০ নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে, সাভারে পুলিশের গুলি ছোড়ার মুহূর্ত।
যেখানে বিক্ষোভকারীরা কোনো হুমকি সৃষ্টি করেনি।

১০৬. আজিমপুরে স্থানীয় এক কর্মকর্তার নেতৃত্বে থাকা সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশ যৌথভাবে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়। বিক্ষোভকারী নেতারা পুলিশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। তবে কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই পুলিশ শটগান থেকে ধাতব গুলি ছোড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ও ভিডিও ফুটেজ অনুযায়ী, পুলিশের গুলি এক ডজন বিক্ষোভকারীকে আহত করে। গুলিবিদ্ধদের মধ্যে ছিল ১৭ বছর বয়সী এক স্কুল শিক্ষার্থী। সে যখন আহত অবস্থায় মাটিতে পড়েছিল, তখন পুলিশ কর্মকর্তারা কাছে গিয়ে তার বুকে কাছ থেকে গুলি চালায়, এতে তার মৃত্যু হয়। পুলিশের বাধার কারণে তার পরিবার হাসপাতাল থেকে মরদেহ নিতে তিনদিন অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়।

১০৭. রামপুরা ও বাড্ডায় হাজারো শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভে অংশ নেন। পুলিশ এবং সশস্ত্র ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা তাদের ওপর একের পর এক হামলা চালায়। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ভেতরে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের লঙ্ঘন। এ সময় আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণ চালায়। বিক্ষোভকারীরা প্রতিরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের লক্ষ্য করে শটগান ও রাইফেল থেকে প্রাণঘাতী গুলি চালায়। আওয়ামী লীগ সমর্থকরা পালিয়ে গেলে প্রায় ৬০ জন পুলিশ সদস্য ক্যাম্পাসের একপাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারা নিরাপত্তার জন্য পাশের কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাদে আশ্রয় নেয়। বিক্ষোভকারীরা ভবনের নিচতলায় আগুন ধরিয়ে দিলেও ছাদে ওঠেনি। পুলিশ তখনো জনতার ওপর গুলি চালাতে থাকে, পরে র‍্যাবের হেলিকপ্টার অভিযানে তাদের উদ্ধার করা হয়।

১০৮. ১৯ জুলাই বিএনপি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের (আইএবি) কর্মীসহ বিভিন্ন বিক্ষোভকারী পল্টনে বায়তুল মোকাররম মসজিদের কাছে জড়ো হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য ও ভিডিও-ছবির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া তথ্য বলছে, সেখানে পুলিশ ও কিছু সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে প্রাণঘাতী গুলি চালায। এ সময় অন্তত একজন নিহত হন। বিক্ষোভকারীদের অনেকে পালানোর চেষ্টা করেন বা নিজেদের রক্ষার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ নিরস্ত্র থাকার বার্তা দিতে হাত তুলে রাখেন, যদিও কিছু ব্যক্তি পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেছিলেন।

BANGLA NEWS 24 .com

১০৯. ঢাকার বাইরেও নিরাপত্তা বাহিনী আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন করে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করেছে। ১৮ জুলাই কুমিল্লায় একদল শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করেন। সমন্বিত অভিযানে পুলিশ, বিজিবির সহায়তায় বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট এবং প্রাণঘাতী গুলি চালায়। একইসঙ্গে, স্টিল রড হাতে থাকা ছাত্রলীগের সমর্থকেরা বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালায়। নারী বিক্ষোভকারীরাও রেহাই পাননি, তাদের মধ্যে কয়েকজন ছাত্রলীগের সশস্ত্র সমর্থকদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হন।

১১০. ১৮ জুলাই নরসিংদী কেন্দ্রীয় কারাগারের কাছে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ শটগান থেকে গুলি ছোড়ে। এতে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোর আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সে যখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তখন পুলিশ তাকে কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। অন্য আহতদের মধ্যে ছিল ১৬ বছর বয়সী আরও এক কিশোর। পরদিন ক্ষুব্ধ জনতা নরসিংদী কারাগারে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ৮ শতাধিকেরও বেশি বন্দি পালিয়ে যায় এবং ৮৫টি আগ্নেয়াস্ত্র লুট হয়। পুলিশ তখন জনতার ওপর রাইফেল ও শটগান থেকে গুলি ছুড়তে থাকে, হামলাকারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য না করেই নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। স্থানীয় হাসপাতালে দুই দিনে তিনশর বেশি আহত রোগী ভর্তি হয়।

BANGLA NEWS 24 .com

অতিরিক্ত ও নির্বিচার গুলি চালিয়ে সহিংস বিক্ষোভ দমন

১১১. পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর বে-আইনি বলপ্রয়োগ জনতার ক্ষোভ আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা জনগণের মাঝে এমন কিছু সৃষ্টি করে দেয়, যা প্রতিশোধমূলক হয়ে ওঠে ও তারা হামলা চালায়। এসব হামলার লক্ষ্য ছিল প্রধানত পুলিশ স্থাপনা, সরকারি ভবন এবং সাবেক সরকার প্রধান শেখ হাসিনার শাসনামলে নির্মিত অবকাঠামো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ ও সরকারি ভবন আক্রান্ত হয়। তখন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রাণনাশের হুমকির মুখে পড়েছিলেন। সে সময়টায় অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার যৌক্তিক ছিল। তথ্য ও সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুযায়ী, অন্যান্য অনেক ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়মিতভাবে নির্বিচারে অতিরিক্ত গুলি চালিয়েছে।

১১২. গুলি চালাতে পুলিশের প্রতি কী ধরনের নির্দেশনা ও অপারেশনাল পরিকল্পনা ছিল, তা কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছিল ওএইচসিএইচআর। জবাবে বাংলাদেশ পুলিশ শুধু কিছু প্রাসঙ্গিক নথির রেফারেন্স নম্বর ও প্রকাশের তারিখ সরবরাহ করে। যদিও নথিগুলোর মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ করেনি।

১১৩. সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরকে জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনীকে আগ্নেয়াস্ত্র (প্রাণঘাতী) ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সেখানে, যেখানে কম প্রাণঘাতী অস্ত্র যথেষ্ট হতো না। বিশেষ করে বিক্ষোভ দমনের ক্ষেত্রে সরকারি ভবন বা অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনায় হামলা প্রতিরোধে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সরকার মূল অবকাঠামো হিসেবে যেসব স্থাপনাকে বিবেচনা করেছিল, সেগুলোর ওপর হামলা মৃত্যুর বা গুরুতর আহত হওয়ার আসন্ন ঝুঁকি সৃষ্টি করুক বা না করুক,

তাতে কোনো বিবেচনা করা হয়নি। কিন্তু এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থি। কারণ, এই আইন অনুযায়ী জনসমাবেশে অস্ত্রের ব্যবহার কেবল তখনই বৈধ, যখন তা মৃত্যুর বা গুরুতর আহত হওয়ার আসন্ন ঝুঁকি প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়, শুধু সম্পদ রক্ষার জন্য নয়।

১১৪. ওএইচসিএইচআরের নথিভুক্ত তথ্যে দেখা গেছে, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি বাস্তব পরিস্থিতিতে আরও এগিয়ে গিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জনতার মধ্যে কিছু অংশ সহিংসতায় জড়িত হলে, নিরাপত্তা বাহিনী প্রায়ই সম্পূর্ণ জনতার ওপর নির্বিচারে ও ব্যাপকভাবে প্রাণঘাতী গুলি চালিয়েছে। তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী, সম্পদ বিনষ্টকারী এবং মৃত্যুর বা গুরুতর আহত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করা কিছু ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি। এতে পথচারীরাও আহত হয়েছেন, এমনকি ছোট শিশুরাও এই নির্বিচার গুলির শিকার হয়েছে, যা আরও স্পষ্টভাবে এ ধরনের গুলি চালানোর যথেচ্ছ ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়।

১১৫. সম্পৃক্ত সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য ও অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া তথ্য ওএইচসিএইচআরের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা, এই নির্বিচার বলপ্রয়োগ ১৮ জুলাই রাতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের দেওয়া নির্দেশনার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। পরদিন ১৯ জুলাই এই নির্দেশনা আরও জোরদার করা হয়।

১১৬. ওএইচসিএইচআরের তথ্য অনুযায়ী, ১৮ জুলাই বিকেল ও সন্ধ্যায় রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের সদর দপ্তরে একদল সহিংস বিক্ষোভকারী হামলা চালায়। টিভি স্টেশনে মোতায়েন পুলিশের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। ২৮ জন সেখানে হামলা চালিয়েছিল। তারা টিভি চ্যানেলের চত্বরে যানবাহনে ও ভবনের একটি অংশে আগুন লাগিয়ে দেয়। সে সময় টিভি স্টাফরা ভবনের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তাদের জীবন রক্ষা এবং টিভি স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিপক্ষের হাতে চলে যাওয়া ঠেকানোর জন্য সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুনঃনিশ্চিত আদেশে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন, বিজিবিকে টিভি স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১১৭. একজন সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, বাংলাদেশ টেলিভিশনে হামলার পর থেকে বিজিবিকে 'স্ট্রাইক ফোর্স' হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি 'কোর কমিটি' বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, যেখানে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। ওই সভায় অংশ নেওয়াদের মধ্যে একজন ওএইচসিএইচআরকে জানিয়েছেন, বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজিবি কমান্ডারকে প্রকাশ্যে নির্দেশ দেন, যেন তারা আরও সহজে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেন। সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য অনুসারে, পরদিন ১৯ জুলাই আরেকটি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নিজেই নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন বিক্ষোভ দমন করতে প্রয়োজনে বিক্ষোভকারীদের হত্যা করতে। তিনি বিশেষভাবে বলেন, 'বিক্ষোভের মূল হোতাদের, দাঙ্গাকারীদের গ্রেপ্তার করো, হত্যা করো এবং তাদের মরদেহ লুকিয়ে ফেলো।' ওএইচসিএইচআরের মতে, এই সাক্ষ্য

BANGLA NEWS 24 .com

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সরকারের মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ১৯ জুলাই সাংবাদিকদের দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে তিনি বলেন, 'নিরাপত্তা বাহিনীকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'। এই ধরনের নির্দেশনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে স্পষ্টতই সাংঘর্ষিক।

১১৮. ওএইচসিএইচআরের তথ্যমতে, প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ পুনর্ব্যক্ত হওয়ার পরপরই এর প্রভাব সরাসরি মাঠপর্যায়ে দেখা যায়। ১৮ জুলাই যেখানে আনুমানিক ১০০ জন নিহত হয়েছিল, সেখানে ১৯ জুলাই একদিনের ব্যবধানে নিহতের সংখ্যা প্রায় তিনশোতে পৌঁছে যায়, যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি।

১১৯. বিজিবি ওএইচসিএইচআরকে দেওয়া আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের মহাপরিচালক ও সামরিক এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা বিজিবিকে মৌখিকভাবে 'সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহারের' নির্দেশ দেন।

১২০. তবে বিজিবি ওএইচসিএইচআরকে জানায়, তারা কেবল প্রাণঘাতী পরিস্থিতিতে বল প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। তাদের বাহিনী কেবল সতর্কতামূলক গুলি চালিয়েছে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই দাবি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) প্রতিবেদনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। এনএসআইয়ের প্রতিবেদনে বিজিবির গুলিতে তিনটি হত্যাকাণ্ড এবং একটি সম্ভাব্য চতুর্থ হত্যার বিবরণ রয়েছে। চতুর্থ হত্যাকাণ্ডটি বিজিবি বা পুলিশের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। ওএইচসিএইচআরের সংগ্রহ করা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অনুযায়ী, বিজিবি ও পুলিশ ১৯ জুলাই রামপুরা ও বাড্ডায় যৌথভাবে বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী গুলি চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা ও আহত করে।

ঘটনা-৪: রামপুরা ও বাড্ডায় নির্বিচারে গুলি (১৯ জুলাই ২০২৪)

ওএইচসিএইচআরের তথ্যমতে, গত ১৯ জুলাই রামপুরা ও আশপাশের এলাকায় বিক্ষোভ ব্যাপক সহিংসতায় রূপ নেয়। এ সময়টিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে রক্ষায় সেটির আশপাশে কাউকে বিক্ষোভ না করতে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল নিরাপত্তা বাহিনী। বিজিবির প্রতিবেদন অনুযায়ী, রামপুরায় ২০০ জনের কম বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয় এবং তারা ১৫ থেকে ২০ হাজার 'আক্রমণাত্মক' বিক্ষোভকারীকে কেবল আকাশে গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করেছে।

ওএইচসিএইচআরের পাওয়া ২১ ও ২২ নম্বর ছবি। ১৯ জুলাই রামপুরায় বিজিবির মোতায়েন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে তাদের হাতে সামরিক রাইফেল দেখা গেছে।

তবে ওএইচসিএইচআরের সংগ্রহ করা তথ্য ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এ দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিভিন্ন

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, গুলির প্রভাব বিশ্লেষণ এবং ছবির ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর নিশ্চিত হয়েছে, বিজিবি ও বাংলাদেশ পুলিশ সরাসরি বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে রাইফেল ও শটগান দিয়ে প্রাণঘাতী গুলি চালিয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে দেখেছেন। তিনি বলছিলেন, [সামরিক] রাইফেল দিয়ে গুলি করো। এরপর পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের দিকে গুলি চালায়।

একজন ভুক্তভোগী জানান, শুক্রবার সকালে ফজরের নামাজের আগে বাড্ডায় রামপুরা ব্রিজের কাছে বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তিনি বলেন, বিজিবি ও পুলিশ তিন দিক থেকে বিক্ষোভকারীদের কোণঠাসা করে এবং একইসঙ্গে গুলি চালায়। বৃষ্টির মতো আমাদের ওপর গুলি পড়ছিল। এ সময় একটি হেলিকপ্টার ওপর থেকে টিয়ার গ্যাস ছোড়ে এবং এতে থাকা ব্যক্তিদের হাতে অস্ত্র ছিল। গুলিবর্ষণের সময় তার চারপাশে অন্তত ২০ জন গুলিবিদ্ধ হন, যার মধ্যে ১৫ বছর বয়সী একজনও ছিল। অনেকে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তিনি নিজেও পায়ের পাতায় রাইফেলের গুলি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান, কিন্তু পুলিশ এসে চিকিৎসকদের নির্দেশ দেয় যেন তারা প্রতিবাদ সংশ্লিষ্ট আহতদের চিকিৎসা না করেন। পরবর্তীতে তার চিকিৎসার কাগজে গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা উল্লেখ না করে, কেবল 'নরম টিস্যুর আঘাত' বলে উল্লেখ করা হয়।

একজন বিক্ষোভকারী পুলিশের কাছে হাত উঁচিয়ে অনুরোধ করেন, যেন তাকে গুলি না করা হয়, কিন্তু পুলিশ শটগানের গুলি ছুড়ে তাকে আহত করে।

দুপুর ২টার দিকে রামপুরা থানার কাছে এক মাদরাসার ভেতর থেকে এক প্রত্যক্ষদর্শী নির্বিচারে গুলির শব্দ শোনেন। একজন স্থানীয় বাসিন্দাকে গুলি করে হত্যাও করা হয়। এরপর সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এক প্রত্যক্ষদর্শী দেখতে পান, ১৪ বছর বয়সী এক কিশোর মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে স্থানীয় এক মসজিদে আশ্রয় নেয়। ওএইচসিএইচআরের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত করেছেন, শিশুটির মাথার আঘাত উচ্চ-গতির রাইফেলের গুলির কারণে হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, শিশুদের বিরুদ্ধেও প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭ বছর বয়সী এক ছাত্র জানিয়েছে, দুপুর ২টার দিকে নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিচার গুলি দেখে পালানোর চেষ্টা করে সে। কিন্তু তাকেও গুলি করা হয়। তার সহপাঠীও সেখানে ছিল। পরে সে-ই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

BANGLA NEWS 24 .com

নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিচারে গুলিতে কাছাকাছি ভবনগুলোয় থাকা বেসামরিক নাগরিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হন। একজন দোকানি বলেন, গুলির শব্দ শুনে দোকান বন্ধ করার পরও তার দোকানের ভেতর গুলি ঢুকে দেয়ালে আঘাত করে। এতে এক শিশু মাথায় গুরুতর আঘাত পায় এবং শিশুটির দাদি পেটে গুলিবিদ্ধ হন। তাদের হাসপাতালে নেওয়া হলে, দাদি মারা যান। ওএইচসিএইচআরের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দোকানের দেয়ালে পাওয়া গুলির চিহ্ন ও জানালার ভাঙা কাঁচ উচ্চ গতির রাইফেলের গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, মানুষ একটি গ্যারেজে আশ্রয় নিয়েছে এবং আহতদের সাহায্য করার চেষ্টা করছে। গুলিবিদ্ধ ও কাঁদানে গ্যাসের আঘাতে আহতদের চিকিৎসা করার চেষ্টা করছে তারা।

দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্রের কাছে বনশ্রী এ-ব্লকের আশপাশে গুলির ঘটনা চলতে থাকে। এক নারী প্রত্যক্ষদর্শী বিজিবি ও পুলিশ সদস্যদের রাইফেল ও শটগান দিয়ে গুলি চালাতে দেখেন। তিনি ওএইচসিএইচআরকে জানান, মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়া এক শিশুকে সাহায্য করার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি নিজেই রাইফেলের গুলিতে পায়ে আঘাত পান। একই ঘটনায় আহত আরেক ব্যক্তি দেখেছেন, ৯ বছরেরও কম বয়সী এক শিশুর বুকে কীভাবে গুলি চালানো হয়েছে।

এই সাক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ওই এলাকায় এক হাসপাতালে সেদিন ছয়শর বেশি আহত রোগী ভর্তি হয় এবং ২০টি মরদেহ আসে। আরেকটি হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ বহু রোগী চিকিৎসা নেয়, যাদের মধ্যে ১০ বছরের শিশুরাও ছিল।

ওএইচসিএইচআর রামপুরায় পুলিশের পরিকল্পিত হত্যার একটি প্রচেষ্টার তথ্যও নথিভুক্ত করেছে। ১৯ জুলাই বিকেল ৩টার দিকে এক যুবক রামপুরার সড়কে হাঁটার সময় পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে পড়েন। সংঘর্ষ এড়াতে তিনি রামপুরা থানার পাশে নির্মাণাধীন একটি ভবনে প্রবেশ করেন। ওপরের তলায় ওঠার সময় পুলিশ সদস্যরা তাকে ধাওয়া দেয়। কোণঠাসা হয়ে ওই যুবক ভবনের লোহার রড ধরে লুকানোর চেষ্টা করেন এবং স্পষ্টতই কোনো হুমকি সৃষ্টি করছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, ওপরের তলায় থাকা দুই পুলিশ সদস্য তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালান, আরেকজন নিচে অবস্থান

নিয়ে ওপরের দিকে তাক করে গুলি করেন। এ ঘটনায় পাওয়া ভিডিও ফুটেজেও দেখা যায়, একাধিক পুলিশ সদস্য খুব কাছ থেকে ওই যুবকের দিকে গুলি চালাচ্ছে।

সাক্ষ্য অনুযায়ী, পুলিশ সদস্যরা ওই যুবককে ভবন থেকে লাফ দেওয়ার জন্য চিৎকার করতে থাকে। তাকে জোর করে ভবন থেকে নামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ওই যুবক লোহার রড ধরে থাকেন যতক্ষণ না পুলিশ চলে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। ওএইচসিএইচআরের ফরেনসিক বিশ্লেষণে তার ক্ষতগুলোর পরীক্ষা করে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে এবং ধারণা করা হচ্ছে, গুলিগুলো ৬-৯ মিমি ফুল মেটাল জ্যাকেট প্রজেক্টাইল ছিল। ভুক্তভোগীর শরীরে মোট ছয়টি গুলির ক্ষত পাওয়া যায়।

যাচাইকৃত ভিডিও থেকে নেওয়া ও ওএইচসিএইচআরের ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ২৩ থেকে ২৭ নম্বর ছবিতে আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়, ১৯ জুলাই রামপুরায় একটি ভবনের সঙ্গে ঝুলে থাকা এক ব্যক্তির দিকে বারবার গুলি চালাচ্ছে পুলিশ।

BANGLA NEWS 24 .com

১২১. ওএইচসিএইচআরের তদন্তকারীরা অন্যান্য বিক্ষোভস্থলেও ব্যাপক গোলাগুলির তথ্য নথিভুক্ত করেছেন। যাত্রাবাড়ীতে ১৭ জুলাই থেকেই ব্যাপক গোলাগুলি হয়। বিক্ষোভকারীরা কৌশলগত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করলে তা তীব্রতর হয়। ওএইচসিএইচআরের মতে, সড়কটি খালি করতে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী বিশেষভাবে সহিংস অভিযান চালায়। নিচে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, কীভাবে এই অভিযান রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সরাসরি নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

ঘটনা-৫: যাত্রাবাড়ীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সহিংস উচ্ছেদ (১৬-২১ জুলাই)

যাত্রাবাড়ীতে ১৬ জুলাই পুলিশের টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের জোরপূর্বক ছত্রভঙ্গ করার ঘটনায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৭ জুলাই আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী সমর্থকরা পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর আরও হামলা চালায়। দিন শেষে পুলিশ সামরিক রাইফেল থেকে গুলি চালায় এবং হাসপাতালে আহতদের ঢল নামে। রাতের বেলায় জনতার কিছু অংশ ভাঙচুর ও সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোলপ্লাজা পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। ১৮ জুলাই কিছু মানুষ ইট ছোড়া বা সম্পত্তি ধ্বংসের মতো সহিংস কার্যকলাপে লিপ্ত হলে মহাসড়কের পাশে যাত্রাবাড়ী থানা এলাকার পুলিশ মিশ্র জনতার দিকে শটগান থেকে গুলি ছোড়ে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা করেন কীভাবে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের দিকে গুলি করার সময় দাঙ্গা-বিরোধী গাড়ি বিক্ষোভকারীদের ওপর তুলে দেয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক তরুণী সাক্ষ্য দেন–এক আহত ও নিরস্ত্র তরুণকে তিনি ধরে থাকার সময় পুলিশ কীভাবে গুলি চালিয়ে হত্যা করল। এরপর, তিনি বলেন, সেই পুলিশ কর্মকর্তা দ্বিতীয়বার তার দিকেও গুলি ছোড়েন।

এই ঘটনাগুলো বিক্ষোভ ও সহিংসতাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৯ জুলাই সহিংস একদল লোক ভিড়ের মধ্যে থাকা সাদাপোশাকে দুই পুলিশ সদস্যকে চিহ্নিত করে পিটিয়ে হত্যা করে। তাদের একজনের মরদেহ রায়েরবাগ সেতুতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা স্বীকার করেন, এই গণপিটুনির ঘটনা পুলিশকে একপ্রকার 'যুদ্ধের মেজাজে' নিয়ে যায় এবং এরপর পুলিশি সহিংসতা আরও বেড়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

১৭ জুলাই বিকেল থেকেই বিক্ষোভকারীরা গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কের একটি অংশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকে রাখেন, যেখান দিয়ে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম থেকে জ্বালানিসহ গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ ঢাকায় আনা হয়। সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই 'লাইফলাইন' অবরোধকে সরকারের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয় বলে চিহ্নিত করেন। এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেন কীভাবে অবরোধ ভেঙে দেওয়া যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'কোর কমিটির' সভায় দুইজন অংশগ্রহণকারী নিশ্চিত করেছেন যে, মহাসড়ক উন্মুক্ত করার পরিকল্পনাও সেইসব বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছিল, যেখানে পুলিশ, আধাসামরিক ও গোয়েন্দা প্রধানরা এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন হওয়ার পর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন জ্যেষ্ঠ জেনারেলও যোগ দেন।

২০ জুলাই সরকার পুলিশ, র‍্যাব, সেনাবাহিনী এবং কিছু এলাকায় বিজিবি দ্বারা পরিচালিত যৌথ অভিযান শুরু করে, যার লক্ষ্য ছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অবরোধ ভেঙে দেওয়া। অভিযানের সময়, পুলিশ ও র‍্যাব পরিকল্পিতভাবে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করে। অভিযানে মাঠপর্যায়ে নেতৃত্বদানকারী পুলিশ কমান্ডারদের মহাসড়ক 'যেকোনো মূল্যে' পরিষ্কার করার আদেশ দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা ওএইচসিএইচআর-কে নিশ্চিত করেন যে, এর অর্থ পুলিশকে মহাসড়ক খালি করতে প্রাণঘাতী গুলি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশ মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে থাকা এক পুলিশ কর্মকর্তাকে তার কমান্ডার স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে, যে কোনো বিক্ষোভকারী লাঠি, দা বা ইট ছুড়লে তাকে 'সরিয়ে' দিতে হবে, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করতে হবে। পরবর্তী দুই দিনে, বাংলাদেশ পুলিশ ও র‍্যাব মহাসড়ক বরাবর অগ্রসর হয়ে মহাসড়ক ও সংযোগ সড়কের বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো তাদের পেছনে থেকে যেকোনো পাল্টা আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করেছিল। অভিযানের সাথে সরাসরি জড়িত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে ওএইচসিএইচআর ঘটনাটি যাচাই করেছে এবং ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে এটিকে আরও নিশ্চিত করেছে।

BANGLA NEWS 24.com

ওএইচসিএইচআর কর্তৃক যাচাইকৃত ২৮ নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে,

পুলিশ চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কে এসকেএস রাইফেল থেকে গুলি চালাচ্ছে

২০ জুলাই মহাসড়ক পরিষ্কারের অভিযানের সঙ্গে যুক্ত এক ঘটনায়, কাজলা ফুটওভার ব্রিজের কাছে অবস্থান নিয়ে পুলিশ নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়। বিক্ষোভকারীদের অনেকে পাশের একটি চায়ের দোকানে আশ্রয় নিলে, পুলিশ সেখান থেকে তাদের টেনে বের করে আনে। এক ১৯ বছর বয়সী যুবককে বন্দুক তাক করে দৌড়াতে বাধ্য করে, এবং পিছু হটতে থাকলে পুলিশ তার বুকে গুলি চালায়। আহত অবস্থায় যখন তিনি মাটিতে পড়ে দয়া ভিক্ষা চাচ্ছিল, তখন এক কর্মকর্তা পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে শটগান দিয়ে তার বুকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। আরেকজন নিরস্ত্র বিক্ষোভকারী পালানোর সময় পিঠে চারটি গুলি খেয়ে গুরুতর আহত হলেও কোনোমতে প্রাণে বেঁচে যান।

BANGLA NEWS 24 .com

ওএইচসিএইচআর কর্তৃক যাচাইকৃত ভিডিও থেকে নেওয়া ২৯ নম্বর ছবিতে চা দোকানে গুলির শিকার ১৯ বছর বয়সী তরুণকে দেখা যাচ্ছে

১৭-২০ জুলাই সময়কালে স্থানীয় একটি হাসপাতালে আহত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে হাসপাতালটিতে প্রায় ১,২০০ জন ভর্তি হয়, যাদের মধ্যে অনেকেই গুলিবিদ্ধ বা গুরুতর আহত ছিলেন।

২০ বা ২১ জুলাই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ মহাপরিদর্শক এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার যৌথভাবে যাত্রাবাড়ী পরিদর্শন করেন। সেই সময় তোলা একটি ভিডিও, যা দুজন সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। সেখানে স্থানীয় এক পুলিশ কমান্ডারকে মন্ত্রী ও পুলিশ প্রধানদের ব্রিফিং দিতে শোনা যায়: "একজনকে গুলি করি, মরে একটা, আহত হয় একটা। একটাই যায় স্যার, বাকিডি যায় না"।

দুজন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, ২২ জুলাই পুলিশের মহাপরিদর্শক ও র‍্যাবের মহাপরিচালককে সঙ্গে নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান ব্যক্তিগতভাবে যাত্রাবাড়ী পরিদর্শন করেন এবং নিশ্চিত করেন যে, যৌথ অভিযান ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক উন্মুক্ত করতে সফল হয়েছে।

এদিকে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিনই নিরাপত্তা সংস্থার কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিক্ষোভ এবং সংশ্লিষ্ট অভিযানের বিষয়ে প্রতিবেদন পাচ্ছিলেন। সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর জানায়, তিনটি গোয়েন্দা সংস্থা–ডিজিএফআই, এনএসআই এবং পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ–প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি প্রতিবেদন দিতো। ২১ জুলাই একাধিক প্রতিবেদন থেকে তাকে জানানো হয় যে, নিরাপত্তা বাহিনী অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করছে, যা উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করা হয়।

ওএইচসিএইচআর কর্তৃক যাচাইকৃত ৩০ নম্বর ছবিতে দেখা যায় যে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের চলমান হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ব্রিফিং নিচ্ছেন।

বিক্ষোভের শেষ পর্যায়ে অবৈধ শক্তি প্রয়োগ

BANGLA NEWS 24 .com

১২২. আগস্টের শুরুর দিকে বিক্ষোভ পুনরায় শুরু হলে, পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী পুনরায় অবৈধ শক্তি প্রয়োগ করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে শুরু করে এবং আগের চেয়ে বেশি মাত্রায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ৩ আগস্ট রংপুরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায়, যাতে ৭ জন নিহত এবং অন্তত ১৫ জন আহত হন। গুলি চালানোর আগে, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা জনগণকে সতর্ক করে দেয় যে, যদি তারা পুনরায় বিক্ষোভ করে, তবে পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করবে। নিরাপত্তা বাহিনী মোহাম্মদপুর ও ফার্মগেট সংলগ্ন এলাকায়ও বিক্ষোভকারী এবং দাঙ্গাকারীদের ওপর গুলি চালায়, যা আগস্ট মাসে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। নিহতদের মধ্যে একজন ছিল ১৭ বছর বয়সী কিশোর, যাকে বুকে গুলি করা হয়। যে পুলিশ কর্মকর্তা তাকে গুলি করেছিলেন তার পরিচয় জানা গেলেও তিনি এখনো পলাতক রয়েছেন।

১২৩. বিক্ষোভের শেষ দিন ৫ আগস্টে নিহতের সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। সেদিন কয়েক লাখ মানুষ 'মার্চ অন ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশ নেয়। বিভিন্ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর অনুমান করে যে, সেদিন প্রায় ৪০০ জন নিহত হয়েছিল। এসব হত্যাকাণ্ডের অনেকটাই ছিল রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের পরিকল্পিত পদক্ষেপের ফল, যার উদ্দেশ্য ছিল 'মার্চ অন ঢাকা' কর্মসূচি থামানো। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

ঘটনা ৬: 'মার্চ অন ঢাকা' দমন করতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড (৫ আগস্ট)

বিক্ষোভের নেতাদের প্রকাশ্য ঘোষণা এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জানতে পারে যে, ৫ আগস্ট বিক্ষোভকারীরা ঢাকার কেন্দ্রে একটি বৃহৎ পদযাত্রার পরিকল্পনা করছে। ৪ আগস্ট সকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, যেখানে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশ ও এর স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধানরা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন বলে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। ওই বৈঠকে 'মার্চ অন ঢাকা' প্রতিহত করতে কারফিউ

পুনর্বহাল এবং কঠোরভাবে প্রয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের পর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দেয় যে, কারফিউ অনির্দিষ্টকালের জন্য কঠোরভাবে বহাল থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বিক্ষোভকারীদের 'সন্ত্রাসী' হিসেবে উল্লেখ করে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান–'এই সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন করুন'। ৪ আগস্ট গভীর রাতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আরেকটি বৈঠক হয়, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসার/ভিডিপির প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রধান স্টাফ অফিসার এবং সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেলসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র কর্মকর্তাদের মতে, বৈঠকে সেনাপ্রধান ও অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন যে, ঢাকার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রয়োজনে জোর করে ঢাকার কেন্দ্রস্থলে বিক্ষোভকারীদের প্রবেশ ঠেকাতে পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী এবং বিজিবি মোতায়েন করা হবে। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সিনিয়র কর্মকর্তারা জানান, প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে সেনাবাহিনী ও বিজিবি বিক্ষোভকারীদের ঢাকার কেন্দ্রে প্রবেশ রোধ করবে। তারা ঢাকার কেন্দ্রে প্রবেশের পথগুলো ট্যাংক ও সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে বন্ধ করে দেবে, আর পুলিশ 'বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে' রাখবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

৪ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে তৎকালীন বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর (প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনী) সাবেক মহাপরিচালক বিজিবির মহাপরিচালককে পর পর দুটি হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠান। ওএইচসিএইচআরের কাছে সংরক্ষিত সেই বার্তার হার্ডকপি অনুযায়ী, প্রথমটি একটি সম্প্রচারিত বার্তা, যা পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের ঢাকার কেন্দ্রে পৌঁছানোর রুট সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বিক্ষোভকারী নেতাদের কাছ থেকে পাঠানো বলে মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় বার্তায় একটি ভিডিও লিংক ছিল, যেখানে বিক্ষোভের কৌশল নিয়ে ব্যাখ্যা ছিল এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন, তৃতীয় দূরপাল্লার ইউনিট, ব্যাকআপ ইউনিট ও পেছনের নিরাপত্তা ইউনিট সম্পর্কে ধারণা দিয়ে এই প্রতিরক্ষা লাইনগুলো কীভাবে এড়ানো যায়, সে সম্পর্কে প্রতিবাদকারী নেতাদের নির্দেশনা ছিল।

৫ আগস্ট সকালে সেনাবাহিনী ও বিজিবি মূলত নিষ্ক্রিয় ছিল এবং তারা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেনি। একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সাক্ষ্য দেন যে, সেনাবাহিনী প্রতিশ্রুত পরিমাণে সেনা মোতায়েন করেনি। অন্য একজন কর্মকর্তা জানান যে, বিজিবি প্রতি ঘণ্টায় ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ বিক্ষোভকারীকে নির্দিষ্ট প্রবেশপথগুলো পার হতে দেয়, যেখানে তাদের আটকানোর কথা ছিল। তৃতীয় সিনিয়র এক কর্মকর্তা বলেন, কিছু ভুল হচ্ছে বুঝতে পেরে তিনি সিসিটিভি ফুটেজে দেখেন, উত্তরা থেকে ৫০০-৬০০ বিক্ষোভকারী ঢাকার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসছে, অথচ সেনাবাহিনী তাদের থামাচ্ছে না। চতুর্থ আরেক কর্মকর্তা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্থিতি এগোচ্ছে না।

BANGLA NEWS 24 .com

তবুও 'মার্চ অন ঢাকা' থামাতে এবং বিক্ষোভকারীদের শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছাতে বাধা দিতে গিয়ে অনেক জায়গায় তাদের লক্ষ্য করে প্রাণঘাতী গুলি চালায় পুলিশ। এক পুলিশ কমান্ডার ব্যাখ্যা করেন, "সকালের দিকেই সেনাবাহিনী বুঝে গিয়েছিল যে, শেখ হাসিনার পতন হয়েছে, কিন্তু পুলিশ তা জানতো না। তাই পুলিশ তখনও সরকারের পক্ষে লড়ছিল।" ওএইচসিএইচআর একাধিক স্থানে পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যেগুলোর সবই ছিল একই ধাঁচের। উদাহরণস্বরূপ, চকবাজারে সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা এবং অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা শাহবাগের দিকে যেতে চাওয়া বিক্ষোভকারীদের থামানোর জন্য রাইফেল থেকে গুলি চালায় এবং কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করে। এক প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা দেন, "পুলিশ যাকে দেখেছে, তাকেই গুলি করেছে"। রামপুরা সেতু পার হয়ে বাড্ডার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ ধাতব গুলি ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে, যেখানে কয়েকজন বিক্ষোভকারী ছাত্র আহত হয়। ওই এলাকায় গুলিবিদ্ধ বেশ কয়েকজনকে সকালেই হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজমপুরে পুলিশের গুলিতে আহত ১২ বছর বয়সী এক শিশু জানায়, "পুলিশ সবখানে বৃষ্টির মতো গুলি চালাচ্ছিল" এবং সে অন্তত এক ডজন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছে। সাভারের আশুলিয়ায় পুলিশ প্রথমে চেকপোস্ট বসিয়ে বিক্ষোভকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আরও বেশি বিক্ষোভকারী জড়ো হলে পুলিশ শুরুতে কম প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করলেও পরে প্রাণঘাতী ধাতব গুলিভর্তি শটগান ব্যবহার শুরু করে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, আহত বিক্ষোভকারীদের সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিজেও ধাতব গুলিতে আহত হন। আওয়ামী লীগ সমর্থকরাও বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। সাভার বাসস্ট্যান্ডের আশেপাশে, পুলিশ মিছিলরত জনতার ওপর গুলি চালালে বহু মানুষ হতাহত হয়। এক সাংবাদিক ওই এলাকার কয়েকজন পুলিশ সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাদের মোতায়েনে বাধ্য করেছিলেন, তবে সাধারণ পুলিশ সদস্যরা আর প্রাণহানি ঘটাতে চাননি। সেই এলাকায় গুলি চালানোর ঘটনার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী ৫ আগস্টে নিহত এক ছেলের মৃতদেহ দেখেছিলেন এবং ওএইচসিএইচআর-কে বলেছিলেন যে, "৫ আগস্ট ছিল আমাদের (বিক্ষোভকারীদের) জন্য সবচেয়ে আনন্দের দিন, কিন্তু ছেলেটির মায়ের জন্য ছিল সবচেয়ে দুঃখের"।

৫ আগস্ট সকালে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ ও আনসার সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ পান, যাতে থানা এবং এর কর্মকর্তাদের রক্ষা করা যায়। তারা থানার ভেতর ও চারপাশ থেকে 'মার্চ অন ঢাকা'-তে যোগ দিতে আসা জনতার ওপর রাইফেল ও শটগান দিয়ে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন থাকা কর্মকর্তাদের মতে, কিছু বিক্ষোভকারী পুলিশের দিকে ইট ছুঁড়ছিল। এতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী নিহত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়। নিহতদের

মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী ছিলেন, যাকে দুটি গুলি করা হয়েছিল। এলাকায় মোতায়েন সেনাবাহিনী দুপুরের দিকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করলেও পরে তারা সরে যায়। এরপরই পুলিশ থানার গেটের সামনে থাকা বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এবং সারিবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এসে রাইফেল ও শটগান চালাতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য এবং ভিডিওর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে যে, পুলিশ সদস্যরা আশ্রয় নেওয়া বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা কয়েকজন নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীকে কাছ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে হত্যা করে, পাশাপাশি পুরো জনতার দিকেও গুলি ছোড়ে।

ওএইচসিএইচআর কর্তৃক যাচাইকৃত ভিডিও থেকে নেওয়া ৩১-৩৩ নম্বর ছবিতে ৫ আগস্টের বিকেলে যাত্রাবাড়ী থানা থেকে বেরিয়ে আসা পুলিশকে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি করতে দেখা যায়

BANGLA NEWS 24 .com

একই দিন বিকেলে শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবরে জনগণের উল্লাস শুরু হলেও, কিছু পুলিশ তখনও গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন ছিল কিশোর।

উত্তরায় ৬ বছর বয়সী এক ছেলেকে যখন তার বাবা-মা ‘বিজয় মিছিলে’ নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, যা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য এবং মেডিকেল রেকর্ড দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর মুহূর্তের মধ্যে আনন্দ-উল্লাস শুরু হয়, কিন্তু হঠাৎ গ্রেনেড ও গুলির শব্দে আতঙ্ক সৃষ্টি হলে লোকজন পালাতে থাকে। ছেলেটি উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, তিনি দেখতে পাননি কে গুলি চালিয়েছিল, তবে সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মতো দেখতে কিছু লোক সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করছিল। কাছেই ছিল সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়নের একটি ঘাঁটি এবং প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ওই বাহিনীর সদস্যরা মিছিলের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম পাশে অবস্থান নেয়। তিনি আরও জানান, কয়েকজন মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে, সেখানে এক কিশোরের মাথায় গুলি লাগে।

মিরপুরে বিজয় মিছিলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে আহতদের মধ্যে ১২ বছর বয়সী এক ছেলেও ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি নিশ্চিত করেছে।

৫ আগস্ট বিকেলে গাজীপুরে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়, তার ডান হাতে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার জন ওই মিছিলে উপস্থিত ছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিক্ষোভকারীরা নিরস্ত্র ছিলেন ও কোনো প্রকার হুমকিও সৃষ্টি করেননি। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী কোনো সতর্কতা ছাড়াই গুলি চালানো শুরু করলে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। আনসার গেটের কাছে সড়ক অবরোধ করা মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ফরেনসিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কিশোরটিকে খুব কাছ থেকে শটগানের গুলি ছোড়া হয়। তাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়েছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। গুলি চালানোর আগে নিরাপত্তা বাহিনীর এক সদস্য বলেন, ‘এই হাতে আর পাথর ছুড়তে পারবি না’। কিশোরটির ডান হাতে ৪০টিরও বেশি ধাতব গুলি বিদ্ধ হয়, ফলে তার হাড় ও টিস্যু মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গাজীপুরে আরেকটি ঘটনায় পুলিশ নিরস্ত্র এক রিকশাচালককে ধরে এনে কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। পরে মরদেহটি টেনে নিয়ে যায় এবং আর ফেরত দেয়নি। ফলে পরিবারটি তার দাফন ও শেষকৃত্য করতে পারেনি। সেপ্টেম্বরে ওই হত্যাকাণ্ডের দায়ে এক পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিহতের এক স্বজন ওএইচসিএইচআরের কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, “আমি ন্যায়বিচার চাই, স্বাধীন তদন্ত চাই এবং আমার স্বজনের মরদেহ ফেরত চাই।”

বিকেলের দিকে আশুলিয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন বিক্ষোভকারীরা আশুলিয়া থানা লক্ষ্য করে হামলা চালায়। থানার চারপাশে বহু মানুষ জড়ো হয় এবং পুলিশের বারবার পিছু হটার চেষ্টা সত্ত্বেও তারা ইটপাটকেল ও ধ্বংসাবশেষ ছুড়তে থাকে। জবাবে পুলিশ রাইফেল থেকে নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশ যখন বের হওয়ার জন্য পথ পরিষ্কার করছিল তখন এলোমেলো গুলিবর্ষণ করছিল, যা বিক্ষুব্ধ জনতাকে ভয় দেখানোর জন্যই করা হয়েছিল বলে মনে হয়। এতে বিক্ষোভকারী ও পথচারীদের মধ্যে হতাহতের ঘটনা ঘটে। ১৬ বছর বয়সী এক ছাত্রকে কাছ থেকে গুলি করা হলে তার মেরুদণ্ড গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশে পুলিশ গুলিবিদ্ধ মরদেহগুলো একটি ভ্যানে স্তূপ করে আগুন ধরিয়ে দেয়, যেন পোড়া মরদেহগুলো দেখে মনে হয়, তারা বিক্ষোভকারীদের হাতেই নিহত হয়েছেন।

ওএইচসিএইচআর যাচাই করা ভিডিও থেকে নেওয়া ৩৪ থেকে ৩৭ নম্বর ছবিতে দেখা যায়, আশুলিয়ায় পুলিশ মরদেহগুলো একটি গাড়িতে স্তূপ করে আগুন ধরিয়ে দেয়

১২৪. ওএইচসিএইচআর ৫ আগস্টে ঘটা আরও দুটি ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য নিয়েছে, যা অধিকতর তদন্তের দাবি রাখে।

১২৫. সিলেটের গোয়াইনঘাটে বিজিবি তাদের ক্যাম্প (কম্পাউন্ড) থেকে রাইফেল দিয়ে গুলি চালায়। কয়েকশত লোকের একটি জনতা ক্যাম্পের কাছে জড়ো হয়ে শেখ হাসিনার পদত্যাগ উদযাপন করছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনের হাতে লাঠি ছিল। সেখানে বিজিবির গুলিতে ১২ ও ১৫ বছর বয়সী দুই কিশোরসহ কমপক্ষে পাঁচজন নিহত হয় এবং অনেকে গুরুতর আহত হয়। বিজিবি কমান্ড গুলি চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, কিন্তু দাবি করেছে যে, ক্যাম্পের ভেতরে তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যরা অবস্থান করছিল এবং নিরাপত্তা বাহিনীর স্থাপনার ওপর আগের হামলার কারণে তারাও হামলার আশঙ্কা করছিল। তবে, তারা তাদের দাবির সপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, জনতা থেকে এমন কোনো হামলা হয়নি, যা তাৎক্ষণিক প্রাণনাশ বা গুরুতর ক্ষতির হুমকি সৃষ্টি করতে পারতো। ওএইচসিএইচআর-কে দেওয়া বিজিবির প্রতিবেদনে দেখা যায়, ওই সংঘর্ষে বিজিবির কোনো সদস্য আহত হয়েছেন বলে কোনো তথ্য নেই।

১২৬. গাজীপুরের শ্রীপুরে বিক্ষোভকারীরা বিজিবি সদস্যদের বহনকারী কিছু বাস থামিয়ে ঘিরে ফেলেন। বিজিবি অফিসাররা ভেতরে থাকা অবস্থায় বিক্ষোভকারীরা কিছু যানবাহন অচল করে দেন, দরজা বন্ধ করে দেন এবং বাসগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক বিজিবি সদস্যকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগও রয়েছে। জবাবে বিজিবি রাইফেল দিয়ে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে জানিয়েছেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী। পরে গণমাধ্যম জানিয়েছে, এর ফলে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছয়জন নিহত এবং ৫০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে, যা শ্রীপুর এলাকায় পুলিশের রেকর্ড করা গুলিবিদ্ধ মৃত্যুর সংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওএইচসিএইচআর নিশ্চিত করতে পেরেছে যে, সংঘর্ষস্থলের পাশে থাকা এক ব্যক্তি, যিনি দোকান থেকে ফেরার পথে ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। এ ছাড়া, এনএসআই ওএইচসিএইচআর-কে জানায়, শ্রীপুর এলাকার একটি ধর্মীয় বিদ্যালয়ের এক ছাত্র "বিজিবির গুলিতে নিহত" হয়েছে। তবে, ওএইচসিএইচআর যথেষ্ট প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি, যাতে নির্ধারণ করা যায়, এটি বিজিবির আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালানো হয়েছিল নাকি এটি মাত্রাতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ঘটনা ছিল।

৩. বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত লঙ্ঘনে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততা

১২৭. যদিও আধাসামরিক বাহিনীর কিছু সেনা কর্মকর্তা বিক্ষোভকারীদের গুলি করার সাথে জড়িত ছিলেন, যেমনটি ওএইচসিএইচআর-কে দেওয়া বিজিবি রিপোর্টেও স্বীকার করা হয়েছে; তবে সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠানিকভাবে কতটা জড়িত ছিল, সে সম্পর্কে ওএইচসিএইচআর নিশ্চিতভাবে মূল্যায়ন করতে পারেনি। এ নিয়ে ওএইচসিএইচআর সেনাবাহিনীর কাছে লিখিত তথ্য ও সাক্ষাৎকারের অনুরোধ জানালেও কোনো জবাব পায়নি। আবার সেনাবাহিনীর কার্যক্রম নিয়ে কথা বলতে প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে একটি স্পষ্ট ভয় কাজ করছিল।

১২৮. তবে ওএইচসিএইচআর এমন তিনটি ঘটনার তথ্য নথিভুক্ত করেছে, যেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে শর্ট মিলিটারি রাইফেল থেকে প্রাণঘাতী গুলি চালিয়েছে।

১২৯. দুপুরের দিকে পুলিশ মোহাম্মদপুরে একদল বিক্ষোভকারীকে পিছু হটাতে চেষ্টা করে, যার জবাবে বিক্ষোভকারীরা ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। জীবনহানির কোনো তাৎক্ষণিক ঝুঁকি দেখা না গেলেও একদল সেনাসদস্য রাইফেল হাতে গুলি চালানোর জন্য অবস্থান নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তাদের কমান্ডিং অফিসার এবং একজন বেসামরিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে তারা বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে একাধিকবার গুলি চালায়। ঘটনাটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, ভিডিও ও ছবির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৩০. সেই দিন সেনাবাহিনীর সৈন্যরা রামপুরায় বাংলাদেশ টিভি ভবনের আশপাশে সাঁজোয়া যান (কিছু যান সাদা রং করা, যা সম্ভবত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য প্রস্তুতির অংশ ছিল) মোতায়েন করে, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী আগের দিনই ব্যাপক গুলিবর্ষণ করেছিল। রামপুরা বাজারের কাছে দুপুরের দিকে

BANGLA NEWS 24 .com

সেনারা লাউডস্পিকারে বিক্ষোভকারীদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেয় এবং সতর্ক করে যে তারা 'ব্যবস্থা নেবে' যদি বিক্ষোভকারীরা তাদের কথা না মানে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেনাদের নির্দেশ দেন: "দুই-তিনটি লাশ নিশ্চিত করতে গুলি করো"। শুরুতে সেনারা সতর্কতামূলক ফাঁকা গুলি চালালেও পরে তারা বিক্ষোভকারীদের সরাসরি লক্ষ্য করে গুলি চালায়, যা ওএইচসিএইচআর-এর গোপনে সংগ্রহ করা ছবিতেও দেখা গেছে।

১৩১. ৫ আগস্ট সকালে সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করলেও 'মার্চ অন ঢাকা' কর্মসূচিতে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কিছু জায়গায় তারা বিক্ষোভকারীদের এবং পুলিশকে আলাদা করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেছিল। তবে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে সেনাবাহিনীর ইউনিট সরাসরি বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়, যা তাদের হত্যার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে মনে হয়।

BANGLA NEWS 24.com

ঘটনা-৭: যমুনা ফিউচার পার্কে বিক্ষোভকারীদের দিকে সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ (৫ আগস্ট)

৫ আগস্ট সকাল প্রায় ১০টায় শত শত বিক্ষোভকারী প্রগতি সরণি রোডে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার মেইন গেটের কাছে জড়ো হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সেনাবাহিনীর ইউনিট আগে থেকেই সেখানে অবস্থান করছিল। আনুমানিক ২০ জন সেনাসদস্য সারিবদ্ধভাবে বিক্ষোভকারীদের থেকে ৩০-৪০ মিটার দূরে অবস্থান করছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায়, বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন, "সেনাবাহিনী আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবে না, তাই আমরা আশ্বস্ত বোধ করছিলাম"। অরেক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিলেন, "বিক্ষোভকারীরা আনন্দিত ছিলেন ।"কারণ তারা মনে করেছিলেন সেনাবাহিনী তাদের রক্ষা করতে এসেছে , বিক্ষোভকারীরা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এবং সামরিক সরকার গঠনের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায় সাড়ে ১১টার দিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রথমে তারা আকাশের দিকে গুলি ছোড়েন। কিন্তু হঠাৎ এক সেনাসদস্য একজন ব্যক্তির দিকে বন্দুক তাক করে গুলি চালান। গুলিটি সরাসরি তার মাথায় লাগলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেনাসদস্যরা প্রায় ২০-২৫ রাউন্ড গুলি চালাতে থাকেন এবং গুলি ছুড়তে ছুড়তে বিক্ষোভকারীদের দিকে এগিয়ে যান। ওএইচসিএইচআর এই ঘটনার বিভিন্ন ভিডিও সংগ্রহ ও যাচাই করেছে। ভিডিওর মেটাডাটা ঘটনার তারিখ, সময় এবং স্থান নিশ্চিত করে এবং ওএইচসিএইচআর জিওলোকেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিডিওগুলোর সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং ভিডিও বিশ্লেষণে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, বিক্ষোভকারীরা সেনাসদস্যদের জন্য কোনো হুমকি সৃষ্টি করেছিলেন।

গুলির পর, ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের দিকে এগিয়ে যায় এবং পুরুষ ও মহিলাদের ভারী লাঠি দিয়ে মারধর করে। এতে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এসময় মাথায় গুলিবিদ্ধ ব্যক্তি মাটিতে নিথর অবস্থায় পড়ে ছিলেন, আঘাতের সময় তিনি যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অবস্থায়, তার মাথার ঠিক সামনে রক্তের একটি বিশাল গর্ত দেখা যায়। দুইজন লোক তাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও সেনাসদস্যরা তাদের মারধর করে। এছাড়াও, সেনাসদস্যরা ঘটনাটির ভিডিও এবং ছবি তুলতে থাকা বিক্ষোভকারীদের দিকে হুমকিমূলক অঙ্গভঙ্গি করে।

যমুনা ফিউচার পার্কের ভিডিও থেকে নেওয়া যাচাইকৃত ছবি ৩৮-৩৯; ছবির কৃতিত্ব: অনুমতি ফাইলে সংরক্ষিত, ওএইচসিএইচআর ডিজিটাল ফরেনসিকস দ্বারা বর্ধিত

ভিডিও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ওএইচসিএইচআর অনুমান করে যে, এক সেনাসদস্য ৫০ মিটারেরও কম দূরত্ব থেকে সেই স্থানে গুলি চালিয়েছিলেন, যেখানে লোকটি মাটিতে পড়েছিলেন। এই ঘটনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস রাইফেল বিডি-০৮ ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি চীনা টাইপ ৮১ অ্যাসল্ট রাইফেলের (৭.৬২x ৩৯মি.মি.) লাইসেন্সকৃত একটি বাংলাদেশি সংস্করণ। এই ধরনের প্রজেকটাইল (বুলেট) ৬০০ মিটারেরও বেশি দূরত্ব পর্যন্ত একজন ব্যক্তিকে হত্যা বা গুরুতর আহত করার ক্ষমতা রাখে। ওএইচসিএইচআর-এর মতে, এই ঘটনা একটি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শামিল।

BANGLA NEWS 24 .com

১৩২. বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অভিযানে সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য সুরক্ষামূলক ঢাল হিসেবে কাজ করেছিল, যা তাদের আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হত্যার সুযোগ করে দেয়। এক সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করে বলেন, সেনাবাহিনীর প্রধান ভূমিকা ছিল “পুলিশসহ সামনের সারির নিরাপত্তা বাহিনীর সাহস বাড়ানো”।

১৩৩. ওএইচসিএইচআর একাধিক ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যেখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা পুলিশের দ্বারা বলপ্রয়োগের লঙ্ঘন ঘটানোর সময় নীরব দর্শক ছিলেন এবং বিক্ষোভকারীরা সহিংস প্রতিক্রিয়া জানালে তখনই হস্তক্ষেপ করেছেন। উপরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই সহায়ক ভূমিকা বিশেষভাবে স্পষ্ট ছিল যখন সেনাবাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব এবং বিজিবির যৌথ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী এলাকায়। সেখানে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যদের ঢাল হিসেবে কাজ করেছিল, যারা তখন জনতার ওপর গুলি চালাচ্ছিল।

১৩৪. আরও অনেক ক্ষেত্রে, সেনাসদস্যরা প্রাণঘাতী গোলাবারুদ আকাশে ছুড়েছে, যা স্পষ্টতই বিক্ষোভকারীদের ভয় দেখিয়ে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও এটি জীবনহানির ঝুঁকি তৈরি করেছিল, বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ও উচ্চ ভবনসমৃদ্ধ ঢাকার মতো শহরে। ওএইচসিএইচআর এমন কিছু ঘটনা পেয়েছে, যেখানে মানুষ উপর থেকে আসা গুলিতে নিহত বা আহত হয়েছে, অথবা যারা উঁচু ভবনে দাঁড়িয়েছিল তারা গুলিবিদ্ধ হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে, তারা

আকাশে ছোড়া গুলির আঘাতে হতাহত হয়েছে, যা পরে মাটিতে পড়ে।

১৩৫. সেনাবাহিনীর সিনিয়র সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে না পারা বা তাদের কাছ থেকে লিখিত তথ্য না পাওয়ার কারণে ওএইচসিএইচআর নির্ধারণ করতে পারেনি যে, সেনাবাহিনীর জন্য প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দিষ্ট নির্দেশনা কতটা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের নেতৃত্ব কীভাবে মাঠপর্যায়ে নিয়োজিত অফিসার ও সৈন্যদের জন্য নিয়ম তৈরি করেছিল। তবে সাক্ষীদের, বিশেষত সেনাবাহিনীর সক্রিয় সদস্যদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, ২০ জুলাই সেনাবাহিনী মোতায়েনের শুরু থেকেই অনেক জুনিয়র ও মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। যদিও কিছু ঢাকা-ভিত্তিক ইউনিট, যেগুলোর কমান্ডারদের আওয়ামী লীগের প্রতি সুস্পষ্ট আনুগত্য ছিল, তারা হয়তো কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন।

১৩৬. বিক্ষোভ চলতে থাকায় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর প্রতি নীরব বিরোধিতা বাড়তে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এক মধ্য-পর্যায়ের সেনা কমান্ডার তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের শুধু 'দুষ্কৃতকারীদের' ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেন, যা ছিল অস্পষ্ট ভাষা এবং জুনিয়র অফিসারদের জন্য নিয়ম শিথিলভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ তৈরি করে। ওএইচসিএইচআরকে দেওয়া এক সেনা কর্মকর্তার সাক্ষ্য অনুযায়ী, ৩ আগস্ট সেনাপ্রধান সেনা কর্মকর্তাদের প্রধান দপ্তরের প্রধান মিলনায়তনে একটি বৈঠকে যোগ দিতে বলেন, যা অনলাইনেও সম্প্রচারিত হয়েছিল। বৈঠকে সেনাপ্রধান ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাকে কতটা কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছেন। কিছু কর্মকর্তা প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা বলপ্রয়োগের নির্দিষ্ট ঘটনাগুলো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং জানান যে তারা নিজেদের সহকর্মীদের ওপর গুলি চালাতে চান না।

BANGLA NEWS24 .com

১৩৭. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি বাতিলের সম্ভাবনাও বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিতে সেনা কর্মকর্তাদের অনিচ্ছুক করেছিল। জাতিসংঘ বিক্ষোভ চলাকালীন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছিল। জাতিসংঘের নীতিমালার অধীনে, মানবাধিকার লঙ্ঘনে যুক্ত ব্যক্তিদের শান্তিরক্ষা মিশন বা জাতিসংঘের অন্য কোনো দায়িত্বে নিয়োগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

৪. হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সম্ভাব্য বেআইনি শক্তি প্রয়োগ

১৩৮. র‍্যাব, পুলিশ এবং প্রতিবেদিত তথ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনীর এভিয়েশন ইউনিট বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিতভাবে হেলিকপ্টার মোতায়েন করেছিল। বিশেষ করে, র‍্যাবের কালো হেলিকপ্টার বিক্ষোভকারীদের ভীতি প্রদর্শন এবং তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। সিনিয়র কর্মকর্তাদের মতে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষভাবে আরও বেশি হেলিকপ্টার মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে র‍্যাবের পূর্ববর্তী কৌশলের মতোই বিক্ষোভকারীদের ভয় দেখানো যায় এবং সেনা কর্মকর্তারা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে হেলিকপ্টার মোতায়েনের বিষয়ে অবহিত করছিলেন।

১৩৯. ওএইচসিএইচআরে প্রদত্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, ১৮ জুলাই মিরপুর ও মহাখালী, ১৮ ও ১৯ জুলাই ধানমন্ডি, ১৯ জুলাই বাড্ডা, মোহাম্মদপুর, রামপুরা ও শাহবাগ, ১৯ জুলাই এবং ২ ও ৩ আগস্ট বসুন্ধরা, ২০ জুলাই গাজীপুর এবং ২০ ও ২১ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে বারবার র‍্যাব বা পুলিশের হেলিকপ্টার থেকে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এ ছাড়াও, ১৮ জুলাই রামপুরায় সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছিল।

১৯ জুলাই ঢাকায় মোতায়েন করা একটি র‍্যাব হেলিকপ্টার

চিত্র ৩৭-এ দেখা যাচ্ছে; ছবির কৃতিত্ব: অনুমতি ফাইলে সংরক্ষিত

BANGLA NEWS 24.com

১৪০. সাক্ষীদের ভাষ্যমতে, ১৯-২১ জুলাই সময়কালে বাড্ডা, বসুন্ধরা, গাজীপুর, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, মহাখালী, মোহাম্মদপুর এবং রামপুরায় হেলিকপ্টার থেকে রাইফেল বা শটগানের মাধ্যমে প্রাণঘাতী গোলাবারুদ নিক্ষেপ করা হয়েছিল। ৫ আগস্ট যমুনা ফিউচার পার্ক এলাকায় একজন ব্যক্তি আর্মার-পিয়ার্সিং গুলির টুকরোর আঘাতে আহত হন, যা পরে ওএইচসিএইচআর দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। ভুক্তভোগী দাবি করেন, তাকে জলপাই-সবুজ রঙের একটি হেলিকপ্টার থেকে গুলি করা হয়েছিল।

১৪১. বিক্ষোভকারীদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালানো স্বভাবতই নির্বিচার, যা মানবাধিকার মানদণ্ডের লঙ্ঘন। এক সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন যে, এই ধরনের অস্ত্র নির্দিষ্টভাবে এমন ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, যারা সরাসরি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আসন্ন হুমকি সৃষ্টি করছে।

১৪২. পুলিশের মহাপরিদর্শক ও র‍্যাবের মহাপরিচালক স্বীকার করেছেন যে, র‍্যাবের হেলিকপ্টার থেকে বিক্ষোভকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তবে তারা নিশ্চিত করতে পারেননি যে, র‍্যাবের হেলিকপ্টার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল কি না। র‍্যাব ওএইচসিএইচআরের কাছে জানিয়েছে, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত তাদের হেলিকপ্টার থেকে ৭৩৮টি

টিয়ার গ্যাস শেল, ১৯০টি সাউন্ড গ্রেনেড এবং ৫৫৭টি স্টান গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তবে কোনো রাইফেল বা শটগান ব্যবহার করা হয়নি।

১৪৩. ওএইচসিএইচআর একাধিক ভিডিও সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছে, যেখানে র‍্যাব ও পুলিশের হেলিকপ্টার থেকে টিয়ার গ্যাস লঞ্চার ব্যবহারের দৃশ্য দেখা গেছে। এই লঞ্চারগুলো দূর থেকে রাইফেল বা শটগানের মতো দেখাতে পারে, তবে টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড ছোড়ার সময় একটি স্বতন্ত্র সাদা ধোঁয়ার রেখা সৃষ্টি করে। ওএইচসিএইচআর এমন কোনো ভিডিও সংগ্রহ করতে পারেনি যেখানে স্পষ্টভাবে হেলিকপ্টার থেকে রাইফেল বা শটগান দিয়ে গুলি ছোড়া হয়েছে। তবে এটি লক্ষণীয় যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা যে সময়গুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, তখন সরকার মোবাইল ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে রেখেছিল, ফলে সামাজিক মাধ্যম বা ওয়েবসাইটে ভিডিও প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

১৪৪. সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে, ওএইচসিএইচআর নিশ্চিত বা নাকচ করতে পারছে না যে, হেলিকপ্টার থেকে রাইফেল বা শটগান দিয়ে গুলি চালানো হয়েছিল কি না। এটি সম্ভব যে, ওপর থেকে আসা কিছু গুলি আসলে উঁচু স্থানে অবস্থান নেওয়া বন্দুকধারীদের দ্বারা ছোড়া হয়েছিল, অথবা আকাশে নিক্ষিপ্ত গুলি পরে নিচে পড়ে গিয়ে কারও গায়ে লেগেছে, কিংবা কোনো বস্তুতে লেগে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে ভুক্তভোগীদের আঘাত করেছে। বিষয়টি আরও তদন্তের প্রয়োজন, যেখানে র‍্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনী এবং তাদের হেলিকপ্টারে মোতায়েন করা সদস্যদের পূর্ণ সহযোগিতা অপরিহার্য।

BANGLA NEWS 24 .com

৫. চিকিৎসাসেবায় বাধা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নথিপত্র দানে অস্বীকৃতি

১৪৫. যেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শক্তি প্রয়োগের আশঙ্কা করে বা সহিংসতা সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হয়, সেখানে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। আহত বা আক্রান্ত ব্যক্তিদের, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা শক্তি বৈধ ছিল কি না তা নির্বিশেষে, যত দ্রুত সম্ভব সহায়তা ও চিকিৎসাসেবা দেওয়া আবশ্যক।

১৪৬. বিক্ষোভ চলাকালে আহত বিক্ষোভকারী ও পথচারীদের ব্যাপক চাপ সামলাতে অনেক সরকারি হাসপাতাল আগেভাগেই প্রস্তুতি নেয় এবং চিকিৎসাকর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেন।

১৪৭. বিজিবি জানিয়েছে, তারা স্বেচ্ছায় ৩২ জন আহত বিক্ষোভকারীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। তবে, ওএইচসিএইচআরের নথিভুক্ত তথ্য অনুসারে, এটি একটি ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা যায়, কারণ পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী সাধারণত আহত বিক্ষোভকারীদের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা, জরুরি পরিবহন ব্যবস্থা বা অন্যান্য সহায়তা দেওয়ার কোনো উদ্যোগ নেয়নি, এমনকি তাদের নিজস্ব অবৈধ গুলিবর্ষণের শিকারদের ক্ষেত্রেও নয়। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও হাসপাতালে নেওয়ার দায়িত্ব মূলত অন্য বিক্ষোভকারী ও উদ্বিগ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর পড়ে,

যার মধ্যে অনেক রিকশাচালকও ছিলেন। নিরাপত্তা বাহিনীর এই গাফিলতি আহতদের মধ্যে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৪৮. ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুসারে (ভিডিও ও ছবির মাধ্যমে প্রমাণিত), পুলিশ শুধু চিকিৎসা সহায়তাদানে ব্যর্থই হয়নি, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে তা বাধাগ্রস্ত করেছে, যার মধ্যে শাইখ আশহাবুল ইয়ামিনের মৃত্যুর ঘটনাও রয়েছে।

ঘটনা-৮: পুলিশের গুলিতে আহত শাইখ আসহাবুল ইয়ামিনের চিকিৎসা সেবায় বাধা

১৮ জুলাই সাভারে পুলিশ সদস্যরা শাইখ আসহাবুল ইয়ামিন নামের এক নিরস্ত্র যুবককে একাধিকবার ধাতব গুলি সমৃদ্ধ শটগান দিয়ে গুলি করে, যখন তিনি একটি নীল রঙের পুলিশ আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ারের (এপিসি) ওপর ওঠার চেষ্টা করছিলেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী দেখেন, তিনি (ইয়ামিন) সড়ক পার হয়ে যানবাহনের ওপর ওঠার চেষ্টা করছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী শুনতে পান, পুলিশ গুলি ছুড়ছিল এবং চিৎকার করে বলছিল যে, ওই ব্যক্তির কাছে বোমা থাকতে পারে। পুলিশ প্রথমে সতর্কতামূলক গুলি চালিয়ে সম্ভাব্য বিস্ফোরক থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করে। আরেক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, ইয়ামিন এপিসির ছাদের হ্যাচ (ঢাকনা বা দরজা) বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

ওএইচসিএইচআরের তদন্তকারীদের দ্বারা যাচাইকৃত ভিডিওতে দেখা যায়, দুপুর ১টা ৫৭ মিনিটে এপিসি সাভারের পুরাতন ওভারব্রিজের নিচে পৌঁছায়। এটি প্রধান সড়কে প্রায় ২০ মিনিট ধরে সামনে-পেছনে নড়াচড়া করে এবং কয়েকবার টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ২টা ১৮ মিনিটে ইয়ামিন সড়ক ব্যারিয়ার পার হয়ে পেছন দিক থেকে এপিসির ছাদে ওঠেন। লাল শার্ট এবং বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরা এক ব্যক্তি শটগান দিয়ে ইয়ামিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। চার সেকেন্ড পর দাঙ্গা প্রতিরোধ পোশাক পরিহিত এক পুলিশ সদস্য আরও তিনবার গুলি চালায় এবং ইয়ামিন এপিসির ওপর পড়ে যান। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ গুলির পর ধোঁয়া দেখা যায়।

ওএইচসিএইচআরের যাচাইকৃত অন্যান্য ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, এপিসিটি আহত ইয়ামিনকে নিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক ধরে চলছিল। তিনি দুর্বল ও অসহায়ের মতো যানটির ওপর পড়ে আছেন, কিন্তু তখনও জীবিত ছিলেন। ভিডিও ফুটেজে একটি কণ্ঠ শোনা যায়, যেখানে বলা হয়, “এক্ষুণি হত্যা করো, পিস্তল দিয়ে গুলি করো, নিশ্চিত হও সে যেন বেঁচে না থাকে”। তবে তখন আর কোনো গুলি চালাতে দেখা যায়নি। আহত মানুষটিকে জরুরি চিকিৎসা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং পুলিশ সদস্যরা ইয়ামিনকে এপিসির উপর থেকে ফেলে দেন, ফলে তার মাথা সড়কে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এরপর দুজন দাঙ্গা প্রতিরোধ পোশাক পরা কর্মকর্তা এপিসি থেকে নেমে তার দেহ পর্যবেক্ষণ করেন এবং লাল শার্ট পরিহিত ব্যক্তির সহায়তায় তাকে রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে টেনে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর এপিসি দক্ষিণ দিকে চলে যায় এবং সকল কর্মকর্তা পিছু হটেন। কিছুক্ষণ পরে এপিসি দক্ষিণ দিকে চলে যায় এবং ইয়ামিনের দেহটি ব্যারিয়ারের কাছে রেখে সব অফিসার পিছু হটেন। চলে যাওয়ার সময় এক পুলিশ সদস্য ইয়ামিনের মরদেহের কাছে গিয়ে একটি টিয়ারশেল নিক্ষেপ করেন, যা তার দেহকে বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলে। ভিডিওতে আরও দেখা যায়, পুলিশ সদস্যরা উত্তরে প্রায় ১৫০ মিটার দূরে থাকা বিক্ষোভকারীদের দিকে গুলি চালাচ্ছেন। এক প্রত্যক্ষদর্শীও নিশ্চিত করেন যে, পুলিশ বিভিন্ন দিক থেকে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পর ওই প্রত্যক্ষদর্শী লক্ষ্য করেন যে, ইয়ামিন তখনও শ্বাস নিচ্ছিলেন। ওএইচসিএইচআর যে সমস্ত ভিডিও ও সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে, তার কোনোটিতেই দেখা যায়নি যে, পুলিশের কোনো কর্মকর্তা ইয়ামিনকে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

BANGLA NEWS 24.com

ছবি ৩৮, ইয়ামিনকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি চালানোর যাচাইকৃত ভিডিও থেকে নেওয়া। ছবির কৃতিত্ব: ফাইলে অনুমতি সংরক্ষিত

BANGLA NEWS 24 .com

৩৯ থেকে ৪১ ছবিগুলো আরেকটি যাচাইকৃত ভিডিও থেকে নেওয়া, যেখানে ইয়ামিন আহত অবস্থায় পড়ে থাকার সময় পুলিশ তার দিকে টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড নিক্ষেপ করছে

একদল বিক্ষোভকারী তাকে উদ্ধার করে দুটি আলাদা হাসপাতালে নিয়ে যান। দ্বিতীয় হাসপাতালে ২টা ৪৫ মিনিটে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওএইচসিএইচআরের ফরেনসিক মেডিকেল এবং অস্ত্র বিশ্লেষণে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, ইয়ামিনকে খুব কাছ থেকে ধাতব গুলি (মেটাল পেলেট) সমৃদ্ধ শটগান দিয়ে গুলি করা হয়েছিল। তিনি যখন হাসপাতালে পৌঁছান, তখন তিনি সম্ভবত মারাত্মক রক্তক্ষরণের চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। ওএইচসিএইচআরের ফরেনসিক চিকিৎসকের মতে, তার বাম পাশের বুকে গুলির ক্ষত এবং টিয়ার গ্যাসের রাসায়নিক প্রভাবে শ্বাসকষ্ট– যৌক্তিকভাবে এ দুটি তার মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

যদিও পুলিশ হয়তো মুহূর্তের উত্তেজনায় ইয়ামিনের কার্যকলাপকে প্রাণঘাতী হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছিল, তারা তাকে মাটিতে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকার পরও চিকিৎসা সহায়তা দেননি, যা তাদের দায়িত্ব ছিল। বরং, তারা তাকে এপিসি থেকে ফেলে দেয়, রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায় এবং তার দেহের ওপর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এতে ইয়ামিনের আঘাত আরও গুরুতর হয়, বিক্ষোভকারীদের তাকে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে বাধা সৃষ্টি হয় এবং তাকে হাসপাতালে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় দেরি হয়। এতে তার জীবন রক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

১৪৯. ইয়ামিনের ঘটনাটি ব্যতিক্রম ছিল না। জুলাই অভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসায় নিরাপত্তা বাহিনী সক্রিয়ভাবে বাধা দিয়েছে এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা

ওএইচসিএইচআরের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে। ১৯ জুলাই আহতরা যাতে চিকিৎসাসেবা না নিতে পারেন সেজন্য হেলিকপ্টার থেকে হাসপাতালের সামনে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। একই দিনে অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার হওয়া একটি গ্যারেজে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ।

১৫০. ৪ আগস্ট ফার্মগেট এলাকায় ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরকে গুলি করে আহত করে পুলিশ। এরপর আহত কিশোরকে একটি রিকশায় তুলে দিয়ে চালককে সেখান থেকে তাকে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেয়। তবে রিকশাটিকে কাছাকাছি হাসপাতালগুলোতে যেতে বাধা দেয় পুলিশ সদস্যরা। একপর্যায়ে আহত কিশোরকে নর্দমায় ফেলে দিতে ওই রিকশাচালককে নির্দেশ দেন এক পুলিশ সদস্য। পরে ছেলেটিকে হাসপাতালে যেতে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ, কিন্তু ততক্ষণে সে মারা যায়।

১৫১. ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার আশপাশে পুলিশ যখন বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল, তখন আহতদের সহায়তা করছিলেন এমন এক স্থানীয় ব্যক্তিকে আটক করা হয়। পুলিশ কর্মকর্তারা তাকে জানায় যে, ‘শত্রুদের’ সহায়তা করার শাস্তি হিসেবে তাকে চারবার গুলি করা হবে আর কোথায় গুলি করা হবে তা তাকেই বলতে বাধ্য করা হচ্ছিল। এ সময় ওই ব্যক্তি প্রাণভিক্ষা চাইলেও এক পুলিশ কর্মকর্তা খুব কাছে থেকে তার পায়ে গুলি করেন। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে টেনে নিয়ে নর্দমায় ফেলে রাখেন তারা।

BANGLA NEWS 24 .com

১৫২. ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই), ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই), ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো গুলিবিদ্ধদের শনাক্ত করতে, চিকিৎসক ও আহতদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং তাদের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করতে হাসপাতালগুলোতে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছিল। এভাবে হাসপাতালগুলোর ওপর ব্যাপক নজরদারি চালিয়ে আহতদের চিকিৎসা ব্যাহত করা হয়েছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর সহিংসতার মাত্রা গোপন করতে এবং বিক্ষোভকারীদের চিহ্নিত করতে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই তারা বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে চিকিৎসার নথিপত্র এবং সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করে।

১৫৩. আহত বিক্ষোভকারীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা না দিতে এবং তাদের আঘাত ও সেগুলোর কারণগুলি সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র সরবরাহ না করতে চিকিৎসাকর্মীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা গেছে, উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশেই এই বাধা দেওয়া হয়েছিল, যা হাসপাতাল পরিদর্শনকালে সিনিয়র কর্মকর্তাদের উপস্থিতির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে একই ধরনের বাধা দেওয়ার এই নির্দেশের অস্তিত্ব মিলেছে। উদাহরণস্বরূপ, এক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসকদের চাপ দিয়েছিল যেন গুলিবিদ্ধ মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে ‘দুর্ঘটনাজনিত’ হিসেবে রেকর্ড করে। চিকিৎসকদের হুমকি দেওয়া হয় যে, নির্দেশ না মানলে কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করবে। আরেক হাসপাতালে পুলিশ একজন চিকিৎসককে স্পষ্টভাবে বলেছিল, আহত বিক্ষোভকারীদের ভর্তি না করতে। অন্য এক হাসপাতালে আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্য আহত বিক্ষোভকারীদের চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য

চিকিৎসকদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন। নির্দেশ অমান্যকারী অন্তত দুই চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা শাখা পুলিশ, যার ফলে অন্য চিকিৎসকরা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হন। চতুর্থ এক হাসপাতালে ডিজিএফআই ও এনএসআই কর্মকর্তারা আহতদের চিকিৎসা করা চিকিৎসকদের ভয় দেখিয়েছিলেন, তাদের নাম সংগ্রহ করে এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ১৮ জুলাই আন্দোলনকারীদের চিকিৎসা দিচ্ছিল এমন একটি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাতনামা ফোন কল পায়, যেখানে তাদের হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর ২০ জুলাই থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি হতে বাধা দেয়।

১৫৪. ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য সমর্থকরা হাসপাতালের গেট ও প্রবেশপথের আশপাশে উপস্থিত ছিল এবং বিভিন্ন চেকপয়েন্টে আহতদের বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স, ব্যক্তিগত গাড়ি ও রিকশা থামিয়ে যাচাই করছিল, যা অনেক সময় পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে করা হয়েছিল। এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে, আহতদের সঙ্গে থাকা কিছু বিক্ষোভকারীও চিকিৎসকদের প্রতি আগ্রাসী আচরণ দেখান, যা সময়মতো চিকিৎসাসেবা দেওয়াকে আরও জটিল করে তুলেছিল।

BANGLA NEWS 24 .com

১৫৫. অনেক আহত আন্দোলনকারী, বিশেষ করে গুলিবিদ্ধরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন। বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার চাপ ও ভয়ভীতির কারণে চিকিৎসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে কিছু জায়গায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আহত আন্দোলনকারীদের জরুরি চিকিৎসা দিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যে।

১৫৬. প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে ১৮ জুলাইয়ের পর থেকে অনেক ক্ষেত্রেই ময়নাতদন্ত সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়নি অথবা আদৌ করা হয়নি, যা জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের পরিপন্থি। যেখানে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়, সেখানে ময়নাতদন্ত করা বাধ্যতামূলক। অনেক ক্ষেত্রে, মৃতদেহ সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য পুলিশ মর্গেই আসেনি। একটি বড় হাসপাতালকে সরকার নির্দেশ দিয়েছিল যাতে মরদেহগুলো ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। কিছু পরিবার তাদের স্বজনদের দাফন দেরিতে সম্পন্ন করতে বাধ্য হয় কারণ পুলিশ ময়নাতদন্ত করেনি আবার পরিবারকেও ময়নাতদন্ত ছাড়া মরদেহ নিতে দেয়নি।

৬. নির্বিচারে গণগ্রেপ্তার, যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই আটক এবং নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার

১৫৭. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ, অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দ্বারা নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটকের একটি ধরন খুঁজে পেয়েছে ওএইচসিএইচআর, যা ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতিক আইনে নিশ্চিত ন্যায়বিচারের অধিকার লঙ্ঘন করেছে। পুরুষ ও নারী উভয়ই পুলিশ এবং তাদের গোয়েন্দা শাখার নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের শিকার হয়েছে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এর গোয়েন্দা শাখা, কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড

ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট, র‌্যাব এবং ডিজিএফআই কর্তৃক নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক রাখার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে ওএইচসিএইচআর। এ ছাড়াও দেশের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে ছিলেন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীরা ও তাদের নেতা, রাজনৈতিক দলের সদস্য ও নেতা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থী, পথচারী, শিক্ষক এবং রিকশাচালকের মতো দিনমজুর। শিশুদেরও এ ধরনের গ্রেপ্তারের শিকার হতে হয়েছে। একটি জাতীয় সংবাদপত্রের পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, গণগ্রেপ্তার অভিযানের সময় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ ছাত্র এবং সাধারণ নাগরিক, যেখানে মাত্র ১৫ শতাংশ বিরোধীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৫৮. বেশ কিছু ক্ষেত্রে, বিক্ষোভস্থলের আশপাশে থাকার কারণে, মোবাইলফোনে বিক্ষোভের ছবি বা ভিডিও থাকার কারণে, হাসপাতালে যাওয়ার কারণে লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু বয়সের কারণে বিশেষ করে তরুণদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। কোনো কারণ না জানিয়েই লোকজনকে রাস্তা থেকে তুলে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে জোর করে তুলে নেওয়া হয়েছে। এমনকি যারা হাসপাতালে যাচ্ছিলেন বা বাড়ি ফিরছিলেন, তাদেরও আটক করা হয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, কেবল একটি লাঠি তুলতে গিয়েছিল বলে ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে আটক করা হয়।

১৫৯. দীর্ঘদিনের অনিয়ম অনুসারে, পুলিশ প্রায়ই অপরাধ সংক্রান্ত মামলার এজাহারের (এফআইআর) ভিত্তিতে গণগ্রেপ্তার চালিয়েছে, যেখানে অসংখ্য নাম ও অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের অনেকেরই মামলার সঙ্গে কোনো আইনি সংযোগ ছিল না বা সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলার সঙ্গে তাদের যুক্ত করা হয়েছিল। ওএইচসিএইচআরের সাক্ষাৎকার নেওয়া নির্বিচারে গ্রেপ্তারের শিকার কাউকেই অভিযোগ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়নি বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়নি। সংবিধানের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করার কথা থাকলেও মাত্র অল্প কয়েকজনকে আদালতে নেওয়া হয়েছিল। এক শিক্ষার্থীকে তার বাড়ি থেকে কোনো কারণ না জানিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়, তিন দিন গোপন স্থানে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পরে আদালতে হাজির করা হয়। ওএইচসিএইচআর এমন একটিও মামলা খুঁজে পায়নি যেখানে কোনো বিচারক এই ধরনের ব্যক্তিদের রিমান্ডে রাখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যদিও অনেক রিমান্ড আবেদন ছিল গণমামলার অংশ, যেখানে নাম থাকা ব্যক্তিদের কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না। এক সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করেন, 'যদি কারো কোনোভাবে ঘটনার সঙ্গে দূরবর্তী যোগসূত্র থাকে, তাহলে বিচারক রিমান্ড মঞ্জুর করবেন, কারণ বিচারকরা স্বাধীন নন এবং সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না।'

১৬০. ওএইচসিএইচআর-কে বাংলাদেশ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত ১০ হাজার ৫২৫ জন পুরুষ এবং ২৫ জন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৬৩ জন শিশু। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (৩ হাজার ৮৩ জন পুরুষ যার মধ্যে ২৪ জন কিশোর)। র‌্যাব আরও ১ হাজার ১১৮ জন পুরুষ ও ৩৪ জন নারীকে গ্রেপ্তার করেছে। ডিজিএফআই, এনএসআই, আনসার-ভিডিপি এবং বিজিবি ওএইচসিএইচআর-কে

জানিয়েছে যে, তারা বিক্ষোভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো গ্রেপ্তার করেনি, যদিও বিজিবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে 'প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তার' করার মৌখিক আদেশ পেয়েছে বলে জানিয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছে, এসব গ্রেপ্তার দণ্ডবিধি এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯, অস্ত্র আইন ১৮৭৮ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ১৯০৮-এর আওতায় করা হয়েছে।

১৬১. কারফিউর মধ্যে ইন্টারনেট বন্ধ থাকার কারণে মোট কতজনকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান পেতে গণমাধ্যম ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে হিমশিম খেতে হয়েছে। তবে ওএইচসিএইচআর বহু গ্রেপ্তারের কোনো যৌক্তিক আইনি ভিত্তি খুঁজে পায়নি এবং একটি ঘটনাও নথিভুক্ত করতে পারেনি যেখানে যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, কর্তৃপক্ষের করা মোট ১১ হাজার ৭০২টি গ্রেপ্তারের একটি বিশাল অংশই নির্বিচারে হয়েছে।

BANGLA NEWS 24 .com

ছবি ৪২: ঢাকা শহরে ৩১ জুলাই ২০২৪-এ পুলিশের গ্রেপ্তারের চিত্র প্রদর্শন করছে।

ছবির স্বত্ব: অনুমতি সংরক্ষিত।

ব্লক অভিযান ও গণগ্রেপ্তার

১৬২. বিশেষ করে ১৯ ও ২০ জুলাই রাতে কারফিউ জারির পর থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত, পুলিশ, র‍্যাব এবং সেনাবাহিনী যৌথভাবে বিভিন্ন আবাসিক এলাকা ও ব্লকে অভিযান চালায়, যা বাংলাদেশে 'ব্লক রেইড' নামে পরিচিত। এই অভিযানগুলো ছিল নির্বিচারে গণগ্রেপ্তারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ও বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগঠনের উত্থান দমনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল। সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঢাকার গুলশান বারিধারা, সাভার, যাত্রাবাড়ী, বাড্ডা, শনির আখড়া, বসুন্ধরা, শাহীনবাগ, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে এবং ঢাকা জেলার বাইরে যেমন রংপুরে প্রায়শই এই ধরনের অভিযান চালানো হতো। পুলিশ ও র‍্যাব এই অভিযানগুলো পরিচালনা করলেও সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো ব্যাকআপ ও চারপাশের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। উদাহরণস্বরূপ, জুলাইয়ের শেষের দিকে পুলিশ, র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর প্লাটুন-পর্যায়ের সদস্যরা যৌথভাবে মোহাম্মদপুরে একাধিক ব্লক রেইড পরিচালনা

করে।

১৬৩. ব্লক রেইডগুলো মূলত সেসব এলাকাকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হতো যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, বিরোধী দলীয় কর্মী এবং সম্ভাব্য বিক্ষোভকারীরা থাকেন বলে ধারণা করা হতো, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু এলাকায়। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আশপাশের ছাত্রাবাসগুলোতে অভিযান চালিয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মগোপনে যেতে এবং বারবার অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য করে। এসব অভিযান সাধারণত রাতে চালানো হতো, যেখানে পুলিশ ও র‍্যাব জোরপূর্বক বাড়িতে প্রবেশ করতো এবং কখনও কখনও সম্পত্তি ভাঙচুরও করতো। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে প্রায় ৭০ জন অফিসার তাদের আবাসিক ভবনে প্রবেশ করে এবং বাসিন্দাদের ভয় দেখানোর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। তারা দরজা, আসবাবপত্র এবং টেলিভিশন ভেঙে ফেলেন। যাকে খুঁজছিল তাকে না পেয়ে পাঁচজন ভাড়াটিয়াকে গ্রেপ্তার করেন তারা। কারণ 'ভাবমূর্তি বজায় রাখতে কাউকে না কাউকে তো গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন ছিল তাদের' ওই সাক্ষী জানান। গত ২৩ জুলাই প্রায় ২০ জন পুলিশ কর্মকর্তার পরিচালিত ব্লক রেইডের সময় আরেকজন ভুক্তভোগী গোয়েন্দা শাখা কর্তৃক তার গ্রেপ্তারের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি একটি বিলাসবহুল এসইউভি এবং খোলা দরজাসহ একটি মাইক্রোবাস দেখতে পান। হঠাৎ সশস্ত্র লোকেরা সেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে আর তাদের মধ্য থেকে একজন তার দিকে বন্দুক তাক করে নাম জিজ্ঞাসা করে, ভুল করে তাকে অন্য নামে ডাকে। এরপর কর্মকর্তারা তাকে মাথা ধরে গাড়িতে জোর করে তোলেন। ২২ জুলাই মোহাম্মদপুরে পুলিশ ও র‍্যাব যৌথভাবে পরিচালিত আরেকটি ব্লক রেইডে একই রকম একটি বাস ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন।

BANGLA NEWS 24 .com

১৬৪. বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবং ছাত্রলীগের কর্মীরা অভিযানের সময় নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিলেন। তারা বিক্ষোভকারীদের বাড়ি চিহ্নিত করতে, আহতদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে নিরাপত্তা বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিলেন।

১৬৫. ব্লক রেইডের মাধ্যমে গ্রেপ্তারদের বেশিরভাগই ছিলেন পুরুষ, তবে কিছু নারীও আটক হন। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তার এলাকায় অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর ২৩ জুলাই থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নারীদের আটক করতে শুরু করে। তার পাড়ার বেশ কয়েকজন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

১৬৬. এই ধারাবাহিক গণগ্রেপ্তার সরকার ও নিরাপত্তা খাতের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জ্ঞাতসারে, অনুমোদন এবং তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল, যা বেশ কয়েকজন সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাক্ষ্যে উঠে এসেছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের 'কোর কমিটি' সভায় আলোচনা করা হয়েছিল। এ ছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ ওএইচসিএইচআর-কে ১৩৮ জন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার নাম ও পদবি সরবরাহ করেছে, যার মধ্যে দুটি মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারও রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই কর্মকর্তারা 'গণগ্রেপ্তার/অবৈধ গ্রেপ্তার ও আটকের নির্দেশ, আদেশ বা নির্দেশনা দিয়েছেন'।

১৬৭. সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে, ব্লক রেইডে গ্রেপ্তারদের বেশিরভাগই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আটক হয়েছিলেন, কোনো নির্দিষ্ট অপরাধের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, শুধু তরুণ ও বেকার হওয়ার কারণে, ঢাকায় বসবাস না করার কারণে, পরিচয়পত্র দেখাতে না পারার কারণে বা স্থানীয় পুলিশের কাছে অপরাধী হিসেবে পরিচিত থাকার কারণে অনেককে আটক করা হয়েছিল। এক সাবেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ধারণা, মোট গ্রেপ্তারের প্রায় ৭০ শতাংশই ছিল সাধারণ প্রকৃতির, যেখানে মাত্র ৩০ শতাংশ ছিল যাকে তিনি 'মানসম্মত গ্রেপ্তার' হিসেবে চিহ্নিত করেন, অর্থাৎ ব্যক্তির অপরাধের প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে গেপ্তার করা হয়েছে। সাবেক কর্মকর্তারা আরও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, লক্ষ্যভিত্তিক গ্রেপ্তারগুলো ইলেকট্রনিক নজরদারির তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো, যা জাতীয় টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি), ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশের বিশেষ শাখা ও ডিএমপি বিশেষ বিশ্লেষণ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হতো।

১৬৮. সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং লক্ষ্যভিত্তিক উভয় গ্রেপ্তারই চেকপয়েন্ট এবং রাস্তায় আকস্মিক তল্লাশির সময় পরিচালিত হতো। গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা আটকদের মোবাইল ফোন আনলক করতে বাধ্য করতেন। এরপর বিক্ষোভ-সম্পর্কিত ছবি ও ভিডিও খুঁজে দেখতেন এবং যদি কোনো ছবি বা ভিডিওতে নিরাপত্তা বাহিনী বা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের কোনো লঙ্ঘনের প্রমাণ থাকতো, তাহলে তা মুছে ফেলতেন। সন্দেহজনক মনে হলে অনেক সময় কোনো কারণ না জানিয়েই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়। জুলাইয়ের শেষের দিকে ঢাকার কেন্দ্রস্থলে এক দম্পতিকে পুলিশ থামায়। স্বামীকে হুমকি দেওয়া হয়, অপমান করা হয় এবং তার মোবাইল ফোন আনলক করে বিক্ষোভ-সম্পর্কিত সব ছবি মুছে ফেলতে বাধ্য করা হয়। তিনি ওএইচসিএইচআর-কে জানান যে, শুধু তার বয়স বেশি হওয়ার কারণে তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। আরেকটি ঘটনায়, একজন সাংবাদিককে ঢাকায় একটি চেকপয়েন্টে সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা আটক করেন। তিনি সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার পরও তাকে কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখা হয় এবং ওই এলাকায় তার কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ২১ জুলাই রামপুরায় একটি চেকপয়েন্টে পুলিশ একজন শ্রমিককে আটক করে, কারণ তিনি দুদিন আগে বিজিবির গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তাকে গোয়েন্দা শাখার প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাকে তাৎক্ষণিকভাবে গুলি করে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাকে বলেন, 'তোমার পায়ে তো গুলি লেগেছে, আমরা চাইলে তোমার মাথায়ও গুলি করতে পারি'। জুলাইয়ের শেষ দিকে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) শাখা কয়েকজন তরুণকে রাস্তায় আটক করে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাদের আটকে রাখা হয়।

১৬৯. অন্যান্য স্থানেও পুলিশ নির্বিচারে গণগ্রেপ্তার চালিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রংপুরে পুলিশ নির্বিচারে শত শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, যাদের তারা বিক্ষোভ আন্দোলনের সমর্থক বলে মনে করেছিল। এই গ্রেপ্তারগুলো মিথ্যা গণমামলার ভিত্তিতে করা হয়, যেখানে পুলিশের বিচারবহির্ভূত আবু সাঈদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঢেকে দেওয়ার জন্য সাজানো হয়েছিল।

BANGLA NEWS 24.com

আহতদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার

১৭০. পুলিশ ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন আহত ব্যক্তিদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করেছে, যারা জরুরি চিকিৎসা নিতে যাচ্ছিল, অ্যাম্বুলেন্স থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে তাদেরও আটক করেছে। অথবা আহত ব্যক্তির চিকিৎসা নেওয়ার তথ্য সংগ্রহ করে তাদের খুঁজে বের করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব গ্রেপ্তার কেবল আহত হওয়ার কারণে করা হয়েছে, যদিও তা কোনো অপরাধের প্রমাণ নয়। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর দৃষ্টিতে, বিক্ষোভে অংশগ্রহণের কারণে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক বলপ্রয়োগের কারণে তারা আহত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, জুলাইয়ের শেষের দিকে এক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে যে চিকিৎসাকেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলেন তিনি, পুলিশ সেখান থেকে তার ঠিকানা সংগ্রহ করে। তাকে আটক করে মিন্টো রোডের গোয়েন্দা শাখার প্রধান কার্যালয়ে নিয়ে যায় এবং তিন দিন ধরে নির্যাতন করে। তাকে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়, তার আগের আঘাতগুলোতে আরও আঘাত দেওয়া হয় ও তার আঙুল ভেঙে ফেলা হয়।

১৭১. বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ব্যাপক অভিযান ও গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে এক ডজন ইউনিফর্ম পরিহিত এবং সাদা পোশাকধারী নিরাপত্তা বাহিনী ঢাকার একটি হাসপাতালে ব্যাপক তল্লাশি চালায় ও কর্মীদের ভয় দেখায়। জুলাইয়ের শেষ দিকে গোয়েন্দা বিভাগ এবং অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা ঢাকার আরেকটি হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে সব রোগীর আঙুলের ছাপ নেন এবং বেশ কয়েকজন চিকিৎসাকর্মী ও রোগীকে গ্রেপ্তার করেন। অভিযানের সময় তারা রোগীদের গালিগালাজ করেন এবং বলেন, আহত বিক্ষোভকারীদের মরে যাওয়াই উচিত। আগস্টের শুরুতে বিজিবির একটি ছোট দল ঢাকার একটি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং আহত বিপ্লবীদের খুঁজতে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট (আইসিইউ) তল্লাশি করেন।

১৭২. অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, গ্রেপ্তারের ভয়ে আহত অনেক আন্দোলনকারী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে সাহস পাননি অথবা চিকিৎসা শেষ না করেই হাসপাতাল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, যা তাদের চিকিৎসাহীন অবস্থায় কষ্ট পেতে বাধ্য করেছে।

শিক্ষার্থী ও বিরোধী দলের নেতাদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গ্রেপ্তার

১৭৩. ওএইচসিএইচআর নিশ্চিত করেছে যে, ডিজিএফআই এবং গোয়েন্দা বিভাগ সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় নেতাকে আটক করে রাখে, যাতে তাদের ভয় দেখিয়ে নিশ্চুপ রেখে আন্দোলন দমন করা যায়। এই ছয়জন হলেন: নুসরাত তাবাসসুম, নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের

BANGLA NEWS 24 .com

মজুমদার, সারজিস আলম এবং হাসনাত আবদুল্লাহ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, ১৫ জুলাই থেকেই ডিজিএফআই শিক্ষার্থী সমন্বয়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের দাবি নিয়ে সরকারের সঙ্গে 'আলোচনার' জন্য প্রস্তাব দেয়। ১৮ ও ১৯ জুলাই রাতে ডিজিএফআই প্রথমে তিনজন ছাত্রনেতাকে মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে নিয়ে যায়। এরপর আরও দুজন ছাত্রনেতাকে তাদের বাসা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে আটক করে রাখে। এ দুই ছাত্রনেতাকে আটকের কারণ ও কোথায় রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে তাদের কিছুই জানানো হয়নি। তাদের আইনি সহায়তা দেওয়া হয়নি, তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়নি, এমনকি তাদের বিচারকের সামনে হাজির করা হয়নি।

১৭৪. বিশেষভাবে ওএইচসিএইচআর নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারে যে, নাহিদ ইসলাম, যিনি পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হন, তাকে সাদা পোশাকের সরকারি এজেন্টরা অপহরণ করে ডিজিএফআইয়ের গোপন বন্দিশালা কুখ্যাত 'আয়নাঘরে' নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নির্যাতন করা হয়। পরে তাকে পূর্বাচল এলাকার এক সেতুর নিচে ফেলে রাখা হয় এবং সেখান থেকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ২৬ জুলাই গোয়েন্দা শাখার পরিচয়ে কয়েকজন এজেন্ট ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে থেকে নাহিদ ইসলামকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। ওই হাসপাতালে নির্যাতনে আহত আরেক ছাত্রনেতাও চিকিৎসাধীন ছিলেন। ওই সময় রোগীদের নিয়ে যাওয়ার প্রতিবাদ করেন হাসপাতালটির এক স্বাস্থ্যকর্মী। তখন এজেন্টদের সঙ্গে থাকা এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাকে বন্দুক দেখিয়ে হুমকি দেন। ২৭ ও ২৮ জুলাই আরও চারজন ছাত্রনেতাকে টার্গেট করে অপহরণ করা হয়।

BANGLA NEWS 24 .com

১৭৫. কর্তৃপক্ষ এই নির্বিচারে গ্রেপ্তার পরিচালনার জন্য গোয়েন্দা তথ্য এবং নজরদারি প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে ওএইচসিএইচআর নিশ্চিত করেছে যে, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) মানুষের ব্যক্তিগত যোগাযোগ পর্যবেক্ষণ করে এসব গ্রেপ্তারের জন্য গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করেছে।

১৭৬. বাংলাদেশ পুলিশের ওএইচসিএইচআর-কে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই ছয় ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকার গোয়েন্দা বিভাগ। তবে সাবেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, গ্রেপ্তারের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ডিজিএফআই ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিল। এক সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তা সাক্ষ্য দেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শে যিনি গ্রেপ্তারজনিত নেতিবাচক প্রচারের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন এবং ছাত্রনেতারা যখন নির্বিচারে আটক ছিলেন, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সম্মত হন যে, ডিজিএফআই-এর জড়িত থাকার বিষয়টি একটি মিথ্যা কভার স্টোরি দিয়ে গোপন করা উচিত যে, ছাত্রনেতাদের 'প্রতিরক্ষামূলক হেফাজতে' নিয়েছে গোয়েন্দা শাখা। আটক থাকা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক একটি বিবৃতি পড়তে বাধ্য করা হয়, যেখানে তারা আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। গোয়েন্দা প্রধানের মাধ্যমে সেই ভিডিও প্রকাশ করা হলে ব্যাপক জনরোষ সৃষ্টি হয়। কারণ এটি স্পষ্টভাবে বাধ্যতামূলক বলে মনে হচ্ছিল। আরেকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মতে, ২৯ জুলাই মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। জোরপূর্বক বিবৃতি প্রকাশের ফলে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়ায়

প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকে অপসারণের নির্দেশ দেন। তবে এই নির্বিচারে গ্রেপ্তার বা নির্যাতনের অভিযোগের বিষয়ে কোনো তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এদিকে, শিক্ষার্থীদের মুক্তির জন্য আবেদন করা হলেও আদালত কোনো স্বস্তিমূলক রায় দেননি। অবশেষে ১ আগস্ট সেই ছয় ছাত্রনেতাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৭৭. ১৯ জুলাই থেকে পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ এবং র‍্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনী বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির নেতাদের টার্গেট করে ধারাবাহিক গ্রেপ্তার অভিযান চালায়। ঢাকার আশপাশে গ্রেপ্তারদের অনেককেই গোয়েন্দা শাখার সদর দপ্তরে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। সেখানে তাদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং প্রায়ই নির্যাতন ও অন্যান্য অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা সরাসরি জড়িত ছিলেন। ২৩ জুলাই গোয়েন্দা শাখার নেতৃত্বে এক অভিযানে একজন বিএনপি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে গোয়েন্দা শাখার সদর দপ্তরে শত শত অন্যান্য বন্দির সঙ্গে আটক রাখা হয়, যাদের মধ্যে বিএনপির বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও ছিলেন। একজন বিচারক তার রিমান্ড নিশ্চিত করার পরপরই তাকে পাঁচদিন ধরে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে নির্মম নির্যাতন করা হয়, তাকে মিথ্যা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। যদিও নির্যাতনের কারণে তিনি হাঁটতে পারছিলেন না, তবুও একজন বিচারক তার রিমান্ডের মেয়াদ বাড়িয়ে দেন এবং তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

BANGLA NEWS 24 .com

আটক অবস্থায় নির্যাতন, দুর্ব্যবহার এবং অমানবিক অবস্থা

১৭৮. ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় বিভিন্ন আটক কেন্দ্রে নির্যাতন, দুর্ব্যবহার ও অমানবিক পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তিদের এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে ওএইচসিএইচআর। ভুক্তভোগীদের মধ্যে শিক্ষার্থী, ছাত্রনেতা, সাধারণ শ্রমিক, বিরোধীদলের কর্মী এবং এমনকি শিশুরাও ছিল। ভুক্তভোগীদের নির্মমভাবে পেটানো হতো, যার মধ্যে ছিল আহত অংশে সর্বোচ্চ ব্যথা দেওয়ার জন্য আঘাত করা, বৈদ্যুতিক শক দেওয়া এবং আঙুল ভেঙে দেওয়া। এক প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছেন যে, আটক ব্যক্তিদের চোখ বেঁধে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গোয়েন্দা শাখার সদর দপ্তরের একটি জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিন থেকে চার ঘণ্টা পর এসব বন্দিকে আহত অবস্থায় একটি কক্ষে ফিরিয়ে আনা হয়, তখন মারধরের কারণে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন আর কাঁদছিলেন। এমন অবস্থায়ও তাদের জরুরি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিছু বন্দিকে দিনের পর দিন অনাহারে রাখা হয়। বাকিদের তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুদণ্ডের হুমকি দেওয়া হয়।

১৭৯. মিন্টো রোডের গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে ঢাকায় গ্রেপ্তার হওয়া অনেককে আনা হয়, সেখানে বন্দিদের স্বীকারোক্তি আদায়, তথ্য সংগ্রহ বা ভয় দেখানোর জন্য নিয়মিতভাবে নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ করা হয়। সাধারণত থানাগুলোয় একই ধরনের নির্যাতন চালানো হয়। পুরুষ ও নারী বন্দিদের পাশাপাশি শিশুদেরও এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। একটি ঘটনায়, আন্দোলনে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া পাঁচজন নারীকে ঢাকার একটি পুলিশ স্টেশনে লাঠি দিয়ে পেটানো হয়, এতে তাদের প্রচুর রক্তপাত হয় ও তারা হেমাটোমায় (রক্তনালী ফেটে যাওয়া) ভুগতে শুরু করেন। সেখানে উপস্থিত

একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা একজন ভুক্তভোগীর নিতম্বে প্রচণ্ড আঘাত করে উল্লাস প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাদেরও বিশেষভাবে নারীদের নিতম্বে আঘাত করতে নির্দেশ দেন। তখন এক নারী মুক্তি পেতে কাকুতি-মিনতি করলে এক পুলিশ অফিসার তার মুখে বন্দুক ঢুকিয়ে হত্যার হুমকি দেন, তারপর তার ব্লাউজ চেপে ধরে তার উরু, হাত এবং কব্জিতে আঘাত করেন।

১৮০. পুলিশের (গোয়েন্দা বিভাগ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সিটিটিসি) এবং ডিজিএফআই কর্মকর্তারা ভুক্তভোগীদের পূর্ব-লিখিত স্বীকারোক্তিতে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন, যেখানে তাদের হত্যাকাণ্ড বা রাষ্ট্রীয় ভবনে হামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রাখা হয়। অথবা বন্দিদের ক্যামেরার সামনে এই স্বীকারোক্তি পড়তে বাধ্য করা হয়। এক ভুক্তভোগী জানান, তাকে দীর্ঘ সময় ধরে নিঃসঙ্গ কারাবন্দি রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে কোনো প্রতিবাদে অংশ না নেওয়ার শর্তে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আরেকজন ভুক্তভোগীকে জোর করে লিখিয়ে ও স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়া হয় যে, তিনি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

১৮১. ভুক্তভোগীরা আটক কেন্দ্রে অমানবিক পরিস্থিতির ধারাবাহিক বর্ণনা দেন। তারা জানিয়েছেন, তাদের গোয়েন্দা সদর দপ্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অত্যন্ত গাদাগাদি করে রাখা হতো। সেখানে নিরাপদ পানীয় জলের অভাব ছিল। এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে পানি, বিছানা ও জরুরি চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা হতো।

১৮২. গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে নির্যাতনের অভিযোগ প্রকাশ করলেও, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার আন্দোলনের সময় মিন্টো রোডে গোয়েন্দা বিভাগ সদর দপ্তর পরিদর্শন করলেও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই অভিযোগের বিষয়ে কোনো তদন্ত শুরু করেননি।

BANGLA NEWS 24 .com

১৮৩. ২০ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বন্দিদের আর আদালতে হাজির না করার জন্য অস্থায়ী আদেশ জারি করে এবং ২১ জুলাই থেকে আত্মীয়-স্বজন এবং আইনজীবীদের জন্য সব কারাগারে সাক্ষাৎ স্থগিত করে। এর ফলে বন্দিরা কার্যত বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, এতে তাদের নির্যাতন ও অন্যান্য নিপীড়নের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। যদিও এই নতুন নিয়মগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশের আটক কেন্দ্রে প্রযোজ্য ছিল না, তবে আইনজীবী ও পরিবারের সদস্যদের জন্য আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা একটি রিট পিটিশনের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। আন্দোলন শেষ হওয়ার পর ১৪ আগস্ট হাইকোর্ট আদেশটি স্থগিত করেন এবং কেন এটি অবৈধ হবে না, তার যুক্তি উপস্থাপনের জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন।

৭. সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন

১৮৪. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা, সিলেট ও সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভে অন্তত ছয়জন সাংবাদিক নিহত হন। একটি স্বনামধন্য নাগরিক সমাজ সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ২০০ জন সাংবাদিক আহত হন। কিছু ক্ষেত্রে ওএইচসিএইচআর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিত করেছে, বিক্ষোভকারীদের ওপর

নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিচারে গুলিবর্ষণের সময় সাংবাদিকরা গুলির শিকার হন। তবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে, সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত কাজের কারণে সরাসরি সহিংসতার শিকার হন, যা কখনো কখনো বিক্ষোভকারীদের দ্বারাও ঘটেছে। বিশেষ করে ফটোসাংবাদিকদের বিভিন্ন পক্ষের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে, যারা চায়নি তাদের কার্যকলাপের ছবি তোলা হোক।

১৮৫. ১৮ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে বিক্ষোভ কাভার করার সময় এক সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করে পুলিশ। ১৯ জুলাই সিলেটে পুলিশ বিএনপির সমাবেশে মারাত্মক গুলি ভর্তি শটগান চালায়। প্রতিবাদকারীদের মধ্যে কয়েকজন তাদের পতাকার খুঁটি এবং ইট দিয়ে আত্মরক্ষা করছিলেন। সেখানে পুলিশের গুলিতে নিহতদের মধ্যে একজন সাংবাদিকও ছিলেন যিনি বিক্ষোভের ছবি তুলছিলেন। ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে বর্তমান পুলিশ মহাপরিদর্শক সাংবাদিককে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন, ক্ষমা চেয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, পুলিশ মামলাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করবে।

১৮৬. ১৯ জুলাই ঢাকার এলিফ্যান্ট রোডে এক ফটোসাংবাদিককে পুলিশ সতর্ক করে দেয় যে, তিনি ছবি তোলা বন্ধ না করলে তাকে গুলি করা হবে। কয়েক মিনিট পর একই এলাকায় মাইক্রোফোন হাতে ক্যামেরাম্যানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাংবাদিককে লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি ছোড়ে। এতে তার গলায় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাত লাগে।

BANGLA NEWS 24 .com

১৮৭. সেই দিনই পল্টনে বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ কোনো সতর্কবার্তা না দিয়ে গুলি চালালে এক সাংবাদিক গুলিবিদ্ধ হন। একই ঘটনায় বিক্ষোভকারীরা হত্যার বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ না করায় স্থানীয় গণমাধ্যমের এক সাংবাদিককে মারধর করেন। অন্য এক স্থানে আরেক সাংবাদিককেও বিক্ষোভকারীরা মারধর করেন। তবে তিনি বিদেশি গণমাধ্যমে কাজ করেন বলে পরিচয় দিলে তারা তাকে ছেড়ে দেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সাংবাদিক পুলিশের গুলিতে আহত হন এবং আরেকজন ছাত্রলীগের সমর্থকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন।

১৮৮. ২ আগস্ট সিলেটে ছাত্রদের বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও রাবার বুলেট ছোড়ে। বিক্ষোভকারীরা ইট ছোড়ার পর পুলিশ ধাতব গুলি ছোড়ে, যার ফলে এক সাংবাদিক আহত হন। তার বুকে, মুখে ও মাথায় আঘাত লাগে।

১৮৯. ৪ আগস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থকরা একদল সাংবাদিকের ওপর গুলি চালায়। একই দিনে ফার্মগেট এলাকায় বিক্ষোভকারীরা একজন ফটো সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করেন। আরেকটি ঘটনায় শাহবাগে বিক্ষোভের ভিডিও ধারণ করায় দুই নারী সাংবাদিককে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা হামলার হুমকি দেন।

১৯০. সরকার সাংবাদিকদের স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের অধিকার লঙ্ঘন করে তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও গ্রেপ্তার করেছে। সাংবাদিকরা স্বীকার করেছেন যে, আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ মিডিয়া মালিকদের চাপের কারণে তারা স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেননি। কিছু গণমাধ্যম ভুল তথ্য প্রচার করেছে, যা মূলত গোয়েন্দা সংস্থা ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা তৈরি ও ছড়ানো

হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা, ডিজিএফআই ও এনএসআই এজেন্টরা এমনকি মন্ত্রণালয় ও ডিজিএফআই-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সম্পাদক ও সাংবাদিকদের ফোন করে তাদের অফিস ও বাড়িতে গিয়ে প্রতিবেদন পরিবর্তন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। একটি ঘটনায় র‍্যাব সদস্যরা একটি সংবাদমাধ্যমের অফিসে অভিযান চালিয়ে কর্মচারীদের ওপর হামলা চালায় এবং সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত গুরুতর অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহকারী এক সাংবাদিকের পরিচয় জানার জন্য তাদের বন্দুকের মুখে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এনএসআই এজেন্টরা সংবাদমাধ্যমটিকে হুমকি দেয় যেন ওই তথ্য প্রকাশ না করা হয়।

৮. যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অন্যায়ভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করা

১৯১. ইন্টারনেট বন্ধ (পরিষেবা ধীরগতি, ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশন ব্লক করা, অথবা ইন্টারনেট এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আংশিক বা সম্পূর্ণ ব্যাঘাত) বিপুল সংখ্যক মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, বিশেষ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্য এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি তৈরি করে। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রেও এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ব্যাপকভাবে ইন্টারনেট বন্ধের ঘটনা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে এবং কোনোভাবেই ন্যায়সংগত হতে পারে না। এ ছাড়া, রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য ধরনের নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাহতকরণও সাধারণত নির্বিচারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা একে অসামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। ইন্টারনেটভিত্তিক নির্দিষ্ট যোগাযোগ সেবা বন্ধ করার মতো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ কেবল ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলা রক্ষার মতো বৈধ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একান্ত প্রয়োজন হলে এবং চূড়ান্ত বিকল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ইন্টারনেট বন্ধের সিদ্ধান্ত অবশ্যই স্পষ্ট ও প্রকাশ্য আইনের ভিত্তিতে হতে হবে। যা আদালত বা অন্য কোনো স্বাধীন বিচারিক সংস্থার পূর্বানুমোদনপ্রাপ্ত হবে, পরিষেবা সরবরাহকারীদের আগে থেকেই জানানো হবে এবং কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থার আওতায় থাকবে।

BANGLA NEWS 24 .com

১৯২. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সরকার কোনো পূর্বঘোষণা, যথাযথ প্রক্রিয়া বা ব্যাখ্যা ছাড়াই ইন্টারনেট বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন। সংশ্লিষ্ট জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার এবং ওএইচসিএইচআর-এর কাছে থাকা পরিষেবা সরবরাহকারীদের জন্য পাঠানো অভ্যন্তরীণ নির্দেশনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত মন্ত্রী পর্যায়ে নেওয়া হয় এবং তা জাতীয় টেলিযোগাযোগ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (এনটিএমসি) ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। এই বিশ্লেষণ অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক তদন্ত প্রতিবেদনের ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ওএইচসিএইচআরের সঙ্গে শেয়ার করা হয়েছে।

১৯৩. ১৪-১৫ জুলাই মধ্যরাতের কিছু পর হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) আশপাশে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করতে মোবাইল অপারেটরদের নির্দেশ দেয়

বিটিআরসি। ১৫-১৬ জুলাই রাতে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের আদেশের পরিধি বাড়িয়ে মোট ৫৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিস্তৃত করা হয় এবং বিটিআরসি পুনরায় এ নির্দেশ দেয়। ১৭ জুলাই রাত সাড়ে ১১টায় এনটিএমসি অপারেটরদের নির্দেশ দেয় যে, রাত ১২টা থেকে ফেসবুক ও ইউটিউব ব্লক করতে হবে। মধ্যরাতের কিছু পর সমস্ত ৪জি পরিষেবা বন্ধ করার নির্দেশ দেয় এনটিএমসি। একইসঙ্গে নিজস্ব কারিগরি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় সংস্থাটি। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় বিটিআরসি কেবল অপারেটর ও ইন্টারনেট গেটওয়ে সরবরাহকারীদের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে নির্দেশ দেয়।

১৯৪. পাঁচদিন ধরে গোটা দেশ ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। মানুষ ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য জরুরি অনলাইন পরিষেবাগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং চলমান সংকটের মধ্যে অনেকেই তাদের পরিবারের খোঁজ নিতে পারেনি। এই ইন্টারনেট বন্ধের ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট ক্ষতি হয়, যা এক ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হিসাবে প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২২ জুলাই ব্যবসায়ী নেতারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বৈঠকে ইন্টারনেট বন্ধের প্রভাব সম্পর্কে অভিযোগ করেন।

BANGLA NEWS 24 .com

১৯৫. পরদিন, প্রথমে কয়েকটি এলাকায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পুনরায় চালু হয়, পরে এটি সারা দেশে চালু হয়। তবে, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ এবং টিকটক তখনও ব্লক ছিল। ২৮ জুলাই বিকেলে মোবাইল ইন্টারনেট ধাপে ধাপে পুনরায় চালু করা হয়, যদিও ফেসবুক ও টিকটক তখনও ব্লক ছিল। ২ আগস্ট এনটিএমসির নির্দেশে টেলিগ্রাম ও মেসেঞ্জারও ব্লক করা হয়। ৪ আগস্ট রাত ৮টার দিকে এনটিএমসি নির্দেশ দেয়, মোবাইল ইন্টারনেটকে কেবল ২জি স্তরে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। ৫ আগস্ট প্রায় সকাল সাড়ে ১০টায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এটি পুনরায় চালু করা হয় শুধু শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর।

১৯৬. সরকারের ইন্টারনেট বন্ধের সিদ্ধান্তের বিষয়ে কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তৎকালীন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ঢাকায় বিক্ষোভকারীরা ডাটা সেন্টারে আগুন দিলে ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যায় বলে মিথ্যা দাবি করেন তিনি এবং এই বিভ্রান্তিকর তথ্য তিনি টেলিযোগাযোগ সরবরাহকারীদের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়েছিলেন। তার এই দাবি ওএইচসিএইচআরকে দেওয়া অন্যান্য সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য, অভ্যন্তরীণ সূত্রের তথ্য এবং অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে দেওয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিবৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ওএইচসিএইচআরের হাতে থাকা প্রযুক্তিগত তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণেও এটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে ডাটা সেন্টার আগুনে পুড়ে গেছে বলে দাবি করা এলাকাগুলোর সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ সচল ছিল।

১৯৭. অন্য সময়ে তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী দাবি করেন যে, ভুয়া তথ্যের বিস্তার ঠেকাতে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে। তবে, এক সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ওএইচসিএইচআরকে জানান যে, বাস্তবে ইন্টারনেট বন্ধ করায় বিভ্রান্তিমূলক তথ্য আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৮. ভুয়া তথ্য রোধের পরিবর্তে এই ধারাবাহিক ইন্টারনেট বন্ধের মূল প্রভাব ছিল জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বিস্তার বাধাগ্রস্ত করা। ইন্টারনেট বন্ধের সময় ও ভৌগোলিক পরিধি প্রধান বিক্ষোভস্থল এবং সেই বিক্ষোভ দমন অভিযানের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ১৪-১৭ জুলাই যখন অধিকাংশ বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল তখনও ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল। এ ছাড়া দুটি সম্পূর্ণ ইন্টারনেট বন্ধের ঘটনা ঘটে সেই সময়গুলোতে, যখন সরকার কৌশলগতভাবে দমন অভিযান বাড়ানোর নির্দেশ দেয়। যার ফলে এই প্রতিবেদনে বর্ণিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন সংঘটিত হয়। প্রথমবার ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়, যখন নিরাপত্তা বাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে আরও প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার ৫ আগস্ট সকালে ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ করা হয়, যখন সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশকে 'মার্চ অন ঢাকা' প্রতিহত করতে বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে ইন্টারনেট বন্ধের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারের সহিংস দমন অভিযানের তথ্য গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া প্রতিহত করা, যা অবৈধ এবং অনুচিত উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

১৯৯. এ ছাড়া ইন্টারনেট বন্ধের ফলে বিক্ষোভকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সংগঠিত হওয়া বাধাগ্রস্ত হয়। ওএইচসিএইচআরকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান যে, ইন্টারনেটভিত্তিক পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থী ও বিরোধী দলের কর্মীদের শনাক্ত করা এবং গ্রেপ্তার করা সহজ হয়ে যায়। কারণ তারা তখন সাধারণ ফোন লাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে বাধ্য হয়, যা এনটিএমসি এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর পক্ষে তাদের অবস্থান শনাক্ত করা ও কথোপকথনে আড়ি পাতা সহজ করে তোলে।

BANGLA NEWS 24 .com

৯. বিক্ষোভকারী নারী ও কিশোরীদের লক্ষ্য করে সহিংসতা ও নির্যাতন

২০০. নারী শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্ষোভের সামনের সারিতে ছিলেন এবং সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তবে, পুরুষ-শাসিত নেতৃত্ব কাঠামোর কারণে, বিশেষ করে যখন সরকারের দমনপীড়ন তীব্র হতে থাকে, তখন তারা ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এই প্রবণতা ৫ আগস্টের পরও অব্যাহত থাকে।

২০১. নারী বিক্ষোভকারীরা সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ-সমর্থিত অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের হামলা থেকে রেহাই পায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের নারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার পাশাপাশি রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, ধানমন্ডি, মিরপুরসহ অন্যান্য এলাকায় এবং কুমিল্লা, সাভার, সিলেট ও রংপুরের মতো শহরেও নারী বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। উপরোক্ত নারীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও অন্যান্য অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়।

২০২. নারী বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে সহিংসতা চালানো প্রায়ই লিঙ্গভিত্তিক ছিল, যা বিশেষভাবে নারীদের দমন ও অপমানের জন্য পরিচালিত হয়। এটি

নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা, নারী নেতৃত্ব দুর্বল করা এবং প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো মজবুত করার একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নারী বিক্ষোভকারীদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার সময় হামলাকারীরা মুখ, বুক, তলপেট ও নিতম্বের মতো নির্দিষ্ট অঙ্গগুলোর ওপর আঘাত করে, যা শুধু শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না বরং লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। এসব হামলার সময় নারীদের উদ্দেশ করে 'বেশ্যা', 'রক্ষিতা', 'পতিতা' ইত্যাদি অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করা হয়। আওয়ামী লীগ/ছাত্রলীগের সদস্য ও পুলিশ কর্মকর্তারা নারীদের ধর্ষণ, জোরপূর্বক নগ্ন করা এবং অন্যান্য যৌন সহিংসতার হুমকি দেয়।

২০৩. ওএইচসিএইচআর বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত যৌন সহিংসতার বেশ কয়েকটি ঘটনার তথ্য পেয়েছে। আগস্টের শুরুতে ঢাকায় এক ঘটনায়, বাঁশের লাঠি হাতে একদল ব্যক্তি এক নারীকে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি বিক্ষোভকারী কি না। তার ব্যাগ ও মোবাইল ফোন তল্লাশি করে তারা বাংলাদেশি পতাকা খুঁজে পেলে তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়। তারা তার চুল টেনে ছিঁড়ে, শার্ট ছিঁড়ে ফেলে, এবং বুকে ও নিতম্বে হাত দেয়, পাশাপাশি তার বুকে আঁচড় দেয় ও যৌন নিপীড়নমূলক মন্তব্য ছোড়ে। জুলাই মাসে ঢাকায় অন্য এক ঘটনায় দুই ছাত্রলীগ কর্মী এক নারী বিক্ষোভকারীকে, তার মা-সহ পরিবারের সব নারী সদস্যকে ধর্ষণের হুমকি দেয় এবং তাকে শারীরিকভাবে নিপীড়ন করে, যার মধ্যে ছিল বুকে ও যৌনাঙ্গে হাত দেওয়া এবং অশ্লীল মন্তব্য করা। ঘটনার পর ওই নারী ফোনে ধর্ষণের হুমকি পেতে থাকেন, যা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানিয়েছেন যে, ছাত্রলীগ সমর্থকরা কুমিল্লায় বেশ কয়েকজন মহিলাকে লাঞ্ছিত করে, যার মধ্যে দুজন ছাত্রীও আছে যাদের তারা আটক করে শরীরে অযাচিত হাত দেয় এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

BANGLA NEWS 24 .com

২০৪. বাংলাদেশে যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীরা প্রায়শই অভিযোগ জানাতে অনাগ্রহী থাকেন। কার্যকর রাষ্ট্রীয় প্রতিকার ব্যবস্থা না থাকা, প্রতিশোধের ভয় (বিশেষ করে অপরাধীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলে) এবং সামাজিক কলঙ্কের কারণে তারা অভিযোগ করতে চান না। ভুক্তভোগীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, মনোসামাজিক সহায়তা ও আইনি সেবা পান না। যারা অভিযোগ করতে ইচ্ছুক তাদেরও যথাযথ সুরক্ষা, সম্মান ও স্বনির্ভরতা দেওয়া হয় না। ওএইচসিএইচআরের মতে, নথিভুক্ত ঘটনাগুলোর চেয়ে বাস্তবে আরও অনেক বেশি সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তাই যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাগুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে আরও গভীর ও লিঙ্গ-সংবেদনশীল তদন্ত পরিচালনার সুপারিশ করা হয়।

১০. শিশুদের ওপর সহিংসতা এবং নির্যাতন

২০৫. বহু শিশু, কিশোর বিক্ষোভে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল, যাদের মধ্যে ছিল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এবং অল্পবয়সী শ্রমিক। অন্য শিশুরা কৌতূহলবশত বিক্ষোভ দেখছিল। পথশিশু এবং সমাজের নিম্নআয়ের পরিবারের শিশুরা (টোকাই নামে পরিচিত) আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যেও দেখা গেছে,

আবার বিক্ষোভকারীদের মধ্যেও ছিল। ওএইচসিএইচআর অভিযোগ পেয়েছে, আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দল উভয়ই এই শিশুদের সংঘর্ষে অংশ নেওয়ার জন্য নিয়োগ ও অর্থ দিয়েছে। এই প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আরও তদন্ত প্রয়োজন, কারণ ওএইচসিএইচআর এ ধরনের নিয়োগের কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পায়নি।

২০৬. ঢাকার আজমপুর, বাড্ডা, ধানমন্ডি, ফার্মগেট, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, মোহাম্মদপুর এবং রামপুরা এলাকা ছাড়াও গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর ও সিলেটসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে শিশু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে ওএইচসিএইচআর।

২০৭. উপরোক্ত পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ছাড়াও, নিরাপত্তা বাহিনী রাইফেল ও গুলিভর্তি শটগান দিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শিশু বিক্ষোভকারীদের হত্যা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, মোহাম্মদপুরে পুলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী ও সহিংস দাঙ্গাবাজ মিশ্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে ১৯ জুলাই মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ১৭ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থী নিহত হয়, যদিও সে তখন কোনো হুমকির সৃষ্টি করেনি। ১৮ জুলাই ধানমন্ডিতে পুলিশের গুলিতে ১৭ বছর বয়সী আরেক শিক্ষার্থী নিহত হয়। ধানমন্ডিতেই ১২ বছর বয়সী এক শিশু বিক্ষোভকারী মারা যায়, যার শরীরে আনুমানিক ২০০টি ধাতব গুলি বিদ্ধ হয়েছিল এবং সে রক্তক্ষরণে মারা যায়। অন্য অনেক শিশু স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে বা গুরুতর আহত হয়েছে। ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ধাতব গুলির আঘাতে গুরুতর জখম হয়, ফলে তার একটি পা কেটে ফেলতে হয়। ১৭ বছর বয়সী আরেক কিশোর পুলিশের ধাতব গুলির আঘাতে উভয় চোখে দৃষ্টি হারায়।

২০৮. নিহতদের মধ্যে ছিল অল্পবয়সী শিশুরাও, যাদের তাদের বাবা-মা বিক্ষোভে নিয়ে গিয়েছিলেন অথবা পথচারী হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিল। নারায়ণগঞ্জে ছয় বছর বয়সী এক মেয়ে তার বাসার ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়, যখন সে বিক্ষোভের সংঘর্ষ দেখছিল।

২০৯. শিশুদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রায়ই পুলিশ স্টেশন, গোয়েন্দা শাখার সদর দপ্তর এবং কারাগারে প্রাপ্তবয়স্ক বন্দিদের সঙ্গে আটকে রাখা হয়। সেখানে তাদের ওপর চালানো হয় বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, সহিংস আচরণ এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য জোরপূর্বক চাপ প্রয়োগ করা হয়। বেশ কয়েকজন কিশোরকে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) সদর দপ্তরে অনেক প্রাপ্তবয়স্ক বন্দির সঙ্গে আটক রাখা হয়। রংপুরে ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে ১৩ দিন ধরে স্বেচ্ছাচারিভাবে আটক রাখা হয়। আরও শিশুসহ ছেলেটিকে শত শত লোকের সাথে রাখা হয়, যাদের পুলিশ কর্তৃক আবু সাঈদের হত্যাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

২১০. ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরকে যাত্রাবাড়ী থানায় দুই দিন ধরে নির্যাতন করা হয়, যাতে সে পুলিশের এক কর্মকর্তাকে হত্যার মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেয়। এরপর তাকে গোয়েন্দা শাখার সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে আবার

BANGLA NEWS 24 .com

তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। আটক হওয়ার তিনদিন পর তাকে আদালতে হাজির করা হয়, যেখানে বিচারক তাকে আরও সাতদিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দেন। যদিও তার আইনজীবী আদালতে উল্লেখ করেন যে, সে একজন ভুক্তভোগী শিশু। পরে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের পর, অন্য এক বিচারক তাকে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন ও শিশু আটক কেন্দ্রে রাখার আদেশ দেন, যেখানে সে ৬ আগস্ট পর্যন্ত বন্দি ছিল।

VI. বিক্ষোভ পরবর্তী সময়ে সংঘটিত সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন

২১১. সহিংস জনতা প্রতিশোধমূলক সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, যার মধ্যে পুলিশ কর্মকর্তা ও আওয়ামী লীগ নেতাদের লক্ষ্য করে হত্যার ঘটনাও ছিল, বিশেষ করে আগস্টের শুরু থেকে। কিছু হিন্দু, আহমদিয়া মুসলিম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়, যার মধ্যে তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া এবং উপাসনালয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। এসব হামলার পেছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করছিল। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কারণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয় এবং অরাজনৈতিক শক্তিগুলোর দ্বারা পরিচালিত এই মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে ভুক্তভোগীদের রক্ষা করতে পারেনি।

BANGLA NEWS 24 .com

৬ আগস্ট ঢাকায় তোলা ৪৩ ও ৪৪ নম্বর ছবি, যেখানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের পরবর্তী চিত্র দেখা যাচ্ছে। ছবির কৃতিত্ব: অনুমতি সংরক্ষিত।

১. পুলিশ, আওয়ামী লীগ এবং গণমাধ্যমকে লক্ষ্য করে প্রতিশোধমূলক নির্যাতন

২১২. জনতার কিছু অংশ বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতা বা সমর্থকদের লক্ষ্য করে গণপিটুনিতে হত্যাসহ অন্যান্য গুরুতর প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছিল। সাধারণত হামলার জবাবে ভুক্তভোগীরা তা করেছে বা তাদের নামে অন্যরা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯ জুলাই উত্তরায় একদল জনতা গাজীপুরের সাবেক মেয়রকে ভীষণ মারধর করে এবং গণপিটুনিতে তার এক সহযোগীকে মেরে ফেলে। কারণ তিনি ও তার সাথে থাকা আওয়ামী লীগের কিছু অস্ত্রধারী সমর্থক বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়। ৪ আগস্টের পর থেকে সবচেয়ে গুরুতর ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে। সাবেক সরকার দেশের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ হারাতে থাকায় আওয়ামী লীগ ও পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা বেড়ে যায়। সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জে জনতার একটি বড় অংশ লম্বা ছুরি ও রড নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে তা পুড়িয়ে দেয় এবং যাদের পোশাক স্থানীয় অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের থেকে আলাদা ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। হামলাকারীরা পাঁচজন স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মকর্তা এবং এক সাংবাদিককে হত্যা করে। এক কর্মকর্তাকে প্রথমে প্রকাশ্যে অপমান করা হয়, কান ধরে ওঠবস

করানো হয়, এরপর তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। একই দিনে, সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুর স্টেশনে একদল যুবক হামলা চালায়, যেখানে ১৫ জন পুলিশ সদস্য নিহত হন বলে জানিয়েছে পুলিশ। ৫ আগস্ট ফেনী জেলায় বিক্ষুব্ধ জনতা তিনটি থানা পুড়িয়ে দেয় এবং ১৬ জন পুলিশ কর্মকর্তার ওপর হামলা চালায়। এর আগের দিন আওয়ামী লীগের ৩০০ থেকে ৪০০ জন অস্ত্রধারী সমর্থক বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়, যেখানে ৮ জন বিক্ষোভকারী নিহত ও ৭৯ জন গুরুতর আহত হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

২১৩. রংপুরে আওয়ামী লীগের এক সিটি কাউন্সিলরসহ দলটির অস্ত্রধারী সমর্থকরা বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এরপর সাধারণ জনতা ওই কাউন্সিলর ও তার এক সহযোগীকে পিটিয়ে হত্যা করে। পরে ওই কাউন্সিলরের মরদেহ রাস্তায় টেনে নিয়ে যায়। নরসিংদীতে একদল মানুষ আওয়ামী লীগের ৬ সমর্থককে ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং পিটিয়ে হত্যা করে, কারণ তারা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছিল বলে জানা গেছে।

২১৪. ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পর প্রতিশোধমূলক সহিংসতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বহু থানায় ব্যাপক হামলা চালানো হয় এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশের ৬৩৯টি থানার ৪৫০টি ধ্বংস বা ক্ষতি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তারা পালিয়ে যান বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অন্য কিছু ঘটনায়, কিছু পুলিশ সদস্যকে গণপিটুনিতে বা অন্য কোনোভাবে হত্যা করা হয়।

BANGLA NEWS 24.com

২১৫. ৫ আগস্ট সাভার থানায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের সময় পুলিশ সদস্যরা গুলি করতে করতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সিলেটে কয়েকটি থানায় হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। একটি থানায় আটকে পড়া পুলিশ সদস্যরা স্থানীয় একটি মসজিদে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের রক্ষা করেন। রামপুরায় স্থানীয় একজন ইমাম পুলিশ সদস্যদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

২১৬. ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ যখন বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়, তখন তার জবাবে একদল সহিংস লোক থানাটিতে পেট্রোল বোমা ছুড়ে হামলা চালায়। তারা জোর করে থানায় ঢুকে পড়ে এবং তা লুট করার পর পুড়িয়ে দেয়। হামলাকারীরা দুইজন র‍্যাব কর্মকর্তা এবং অন্তত চারজন আনসার/ভিডিপি ও পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করে। অন্য র‍্যাব ও পুলিশ সদস্যরা আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং তারা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আশ্রয় নেন। বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হলে উত্তরা পূর্ব থানা সহিংস জনতার হামলার শিকার হয়। হামলাকারীরা চারজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যা করে। আশুলিয়ায় পুলিশ সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের হত্যা এবং তাদের মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার পর উত্তেজিত জনতা কমপক্ষে তিনজন পুলিশ কর্মকর্তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। এই তিন স্থানেই নিহত পুলিশ সদস্যদের রক্তাক্ত মরদেহ জনসম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

২১৭. ৫ আগস্ট থেকে উত্তেজিত জনতা আওয়ামী লীগের নেতাদের পাশাপাশি দলটির কার্যালয়গুলোতেও হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দেওয়া সাক্ষ্যের

ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর জানায়, কিছু ক্ষেত্রে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকরাও এসব হামলায় জড়িত ছিল। বিএনপি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে, তাদের স্থানীয় কিছু নেতাকর্মী, বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সংগঠনের সদস্যরা প্রতিশোধমূলক সহিংসতায় অংশ নিয়েছে এবং ১০ আগস্ট দলটি জানায় যে, তারা ৪৪ জন স্থানীয় নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করেছে।

২১৮. ঢাকার ধানমন্ডি রোডে অবস্থিত আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়গুলোর একটি আগস্টের শুরুতে বেশ কয়েকবার হামলার শিকার হয়। ওইসব ঘটনায় অনেকে আহত হয়। পুলিশ, আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী সমর্থক এবং বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) সদস্যদের সহায়তায় ওইসব হামলা প্রতিহত করা হয়। ৫ আগস্ট সব কর্মকর্তা-কর্মচারী চলে যাওয়ার পর একদল লোক ওই কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে তা পুড়িয়ে দেয়। একই দিনে, যাত্রাবাড়ীতে এক আওয়ামী লীগ সমর্থককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। নিহতের পরিবার ওই ঘটনাকে বিএনপি সদস্যদের কাজ বলে দাবি করেছে।

২১৯. সহিংস জনতা আওয়ামী লীগ নেতাদের সরকারি বাসভবন, বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়। এক ঘটনায় বিএনপি সমর্থকরা যুবলীগের এক জ্যেষ্ঠ নেতার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, তারা ওই নেতার বাবা-মাকে জিম্মি করে এবং স্থানীয় এক বিএনপি নেতা তার মুক্তিপণ আদায় করে। বিএনপি সমর্থকরা ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের দখল নেয় এবং যখন পরিবারের এক সদস্য পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে যান, তখন তার ওপর হামলা করে। আরেকটি ঘটনায় যশোরে আওয়ামী লীগের এক স্থানীয় নেতার মালিকানাধীন একটি হোটেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই ঘটনায় আনুমানিক ২৪ জন মারা যান। বিরোধী দলীয় সমর্থকসহ জনতা দলবেঁধে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে হামলা চালায় ও লুটপাট করে। জনতার আরেকটি দল বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ হাসিনার বাবার স্মরণে তৈরি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর লুট করে এবং পেট্রোল বোমা ছুড়ে হামলা চালায়।

BANGLA NEWS 24 .com

২২০. ওএইচসিএইচআর একটি প্রতিশোধমূলক যৌন সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। ভুক্তভোগীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, আগস্ট মাসে এক নারীকে দুই ব্যক্তি আটক করে। তাদের বয়স ও পোশাক দেখে শিক্ষার্থীদের মতো মনে হয়নি। লোক দুজন সেই নারীকে ছাত্রলীগের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করে। এরপর তারা তাকে লক্ষ্য করে যৌন হয়রানিমূলক মন্তব্য করে, তার পোশাক ধরে টান দেয়, তার মুখে একাধিকবার চড় মারে এবং বুকে আঘাত করে। কয়েক দিন পর ওই নারীর ওপর আরেকবার গুরুতর হামলা হয়। হামলাকারীরা তাকে ঘিরে ধরে, তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলে, তার স্তন ও অন্যান্য গোপন অংশে হাত দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে, রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে ভুক্তভোগীকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে দেওয়া হয় না। অন্য আরও ঘটনায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নারী সমর্থকদের মৌখিকভাবে ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়।

ওএইচসিএইচআর মনে করে, উপরে বর্ণিত কারণে এসব নথিভুক্ত ঘটনার বাইরেও আরও অনেক যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, যেগুলোর ব্যাপারে সংস্থাটি

সরাসরি প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে কিছু নারী, যারা নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন বা দৃশ্যমান অবস্থানে ছিলেন, তারা হুমকির মুখে পড়েন বা প্রতিশোধের আশঙ্কা করেন। ফলে অনেকে নিজেদের পরিচয় গোপন করতে মুখ ও চুল ঢেকে চলাফেরা করতে বাধ্য হন।

২২১. শেখ হাসিনার পতনের পরের দিনগুলোতে অনেক পুলিশ কর্মকর্তা কাজে যোগ দিতে ভয় পেয়েছিলেন এবং অনেক স্থানে কার্যত পুলিশি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এতে প্রতিশোধমূলক হামলা এবং সুযোগসন্ধানী অপরাধ আরও বেড়ে যায়। সবচেয়ে বেশি প্রতিশোধমূলক হামলার ঘটনা ৫ আগস্ট এবং তার পরবর্তী কয়েকদিনে ঘটেছে বলে মনে করা হয়। তবে ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পরও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপর হিংস্র ব্যক্তি ও দলের চালানো সহিংস হামলার রিপোর্ট পেতে থাকে ওএইচসিএইচআর। উদাহরণস্বরূপ, সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭৫ সালের হত্যাকাণ্ড স্মরণে গত ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থকরা কর্মসূচি পালন করার সময় হামলার শিকার হন। কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, হামলাকারীদের মধ্যে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকরা ছিলেন, যদিও কিছু শিক্ষার্থী হামলা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। হামলায় আওয়ামী লীগ সমর্থক বহু নারীসহ অনেকে আহত হন। সেদিন একজন আওয়ামী লীগ নেতা গুরুতর আহত হন, যিনি দুই সপ্তাহ পর মারা যান বলে জানা গেছে। গত ১৪ আগস্ট স্থানীয় বিএনপি সমর্থকের নেতৃত্বে এক বিশাল দল আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট সমর্থকের মালিকানাধীন একটি কারখানায় হামলা চালায়। কারখানার মালিকের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য তারা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায় বলে বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে জানা গেছে। দ্বিতীয়বারের হামলায় কারখানাটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। দুটি হামলার সময় সাহায্য চেয়ে ফোন করলে পুলিশ কোনো সাড়া দেয়নি, এমনকি যথাযথভাবে তদন্তও করেনি।

২২২. ওএইচসিএইচআর প্রতিশোধমূলক হামলার প্রকৃত পরিসংখ্যান নির্ধারণ করতে পারেনি, বিশেষ করে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সদস্যদের হত্যার সংখ্যা। আওয়ামী লীগ ওএইচসিএইচআরের কাছে একটি বিশদ তালিকা দিয়েছে, যেখানে নাম, তারিখ এবং হত্যার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। তালিকা অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ১৪৪ জন নেতাকর্মী বিভিন্ন হামলায় নিহত হন। এর মধ্যে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ২৩ জন, ৪ আগস্ট ৩৫ জন, ৫ আগস্ট ৬৮ জন এবং ৬ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত ১৮ জন নিহত হন। ওএইচসিএইচআর স্বাধীনভাবে এই ঘটনাগুলোর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।

২২৩. বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে ৪৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত এবং ২৩০৮ জন আহত হন। বিজিবি তাদের ৩ জন সদস্য নিহত ও ১২৯ জন আহত হওয়ার তথ্য দিয়েছে। আনসার ও ভিডিপির ৩ জন নিহত এবং ৬৩ জন আহত হন। র‍্যাবের ২ জন কর্মকর্তা নিহত এবং ৩০৭ জন আহত হন।

২২৪. সূত্রগুলো প্রতিশোধমূলক হামলার প্রতিবেদন দেওয়া অব্যাহত রেখেছে। যদিও ১৫ আগস্টের পরের ঘটনাগুলি এই প্রতিবেদনের নজর থেকে সাময়িকভাবে

বাইরে আছে, তবুও ওএইচসিএইচআর দৃঢ়ভাবে এই ধরনের সমস্ত রিপোর্ট হওয়া ঘটনার দ্রুত এবং স্বাধীন তদন্তের সুপারিশ করে। যদি তা আমলে নেওয়া না হয়, তাহলে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং ভবিষ্যতের সংহতির জন্য বড় ঝুঁকি তৈরি হবে।

২২৫. আওয়ামী লীগপন্থি বা সাবেক সরকারের সমর্থক বলে মনে করা হয়েছিল এমন সাংবাদিকরাও প্রতিশোধমূলক হামলার শিকার হয়েছেন। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশত্যাগ করার পরপরই উত্তেজিত জনতা একাধিক টেলিভিশন স্টেশনে হামলা চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। তার আগে ৩ আগস্ট একাত্তর টিভিতে লাঠিসোঁটা ও পাথর নিয়ে একদল মানুষ হামলা চালিয়েছিল। তারা দেখতে অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের চেয়ে আলাদা ছিল। ৫ আগস্ট কয়েকশ মানুষ আবারও একাত্তর টিভিতে হামলা করে। তারা জোর করে ভেতরে ঢুকে লুটপাট চালিয়ে স্টেশনটি পুড়িয়ে দেয়। সময় টিভিতে স্থানীয় মানুষ ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত একটি দল হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। এটিএন নিউজে হামলাকারীরা দুই সাংবাদিক ও দুই কর্মীকে মারধর করার পর স্টেশনটিতে লুটপাট ও ভাঙচুর চালায়। এটিএন বাংলা, ডিবিসি নিউজ, মাই টিভি, বিজয় টিভি ও গাজী টিভিও সেদিন হামলার শিকার হয়। ৭ আগস্ট বিএনপির স্লোগান দিতে থাকা প্রায় ২০০ জনের একটি দল আগ্নেয়াস্ত্রসহ মোহনা টিভি স্টেশনে ঢুকে পড়েন। তারা একজন সিনিয়র সাংবাদিককে মারধর করেন এবং স্টেশনটি না পোড়ানোর ও ভাঙচুর না করার শর্তে অর্থ আদায় করেন।

২২৬. হত্যাসহ অন্যান্য সহিংস অপরাধে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংবাদিক অভিযুক্ত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে বিবেচিত বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিককে এ ধরনের মামলার ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এসব মামলা অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে গঠন করা হয়েছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অক্টোবর মাসে গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের হয়রানির মামলা পর্যবেক্ষণের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার একটি কমিটি গঠন করে। ২১ নভেম্বর গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন, হত্যার মামলাগুলো 'পুরনো আইন ও রীতি অনুসরণ করে তাড়াহুড়া করে করা হয়েছে'। বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া মন্তব্যে কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে জানিয়েছে, সাংবাদিকদের নামে মামলা বিদ্যমান আইনের অধীনে ভুক্তভোগীরা দায়ের করেছেন এবং এতে সরকারের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবে সরকার ইঙ্গিত দিয়েছে যে, তদন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে এবং প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করা হবে।

২২৭. ৫ আগস্ট থেকে অনেক সাংবাদিক এবং অন্যান্য সুশীল সমাজের পর্যবেক্ষকরা এক ধরনের পাল্টা ভীতির পরিবেশ অনুভব করেছেন, যেখানে আওয়ামী লীগের পক্ষে সহায়ক বা তাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি সমালোচনামূলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এমন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমগুলো সতর্কতা অবলম্বন করে।

BANGLA NEWS24.com

২. বিভিন্ন ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর নির্যাতন

২২৮. বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও ভাষার মানুষ বাস করে, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা। দেশের বেশিরভাগ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী সুন্নি মুসলমান এবং বাঙালি জাতির অংশ। তবে অন্যান্য সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী অনেক সময় সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়। দেশের সংবিধানে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হলেও, বাংলার ভাষা ও ইসলামের পরিচয়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে, এসব সম্প্রদায়ের মানুষ নানা ধরনের অবহেলা ও অন্যায়ের মুখোমুখি হয়। বিশেষ করে, যখন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়, তখন তাদের অনেক সময় দোষারোপ করা হয় এবং তারা হামলা ও ঘৃণার শিকার হয়। তাদের সমস্যাগুলোকে সত্যের বিকৃতি, ভুল তথ্য ও রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য ব্যবহার করা হয়, যা আসলে তাদের নিজেদের কষ্টের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়।

২২৯. ওএইচসিএইচআর স্বতন্ত্র ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর ওপর হামলার বিষয়ে ৩৪টি সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তাদের মধ্যে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে হামলার শিকার ১২ জন ভুক্তভোগীও ছিলেন। এ ছাড়া, ওএইচসিএইচআর বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সুশীল সমাজ, অধিকারকর্মী, মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু অধিকারের পক্ষাবলম্বী ব্যক্তি, ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়েছে। তবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংঘটিত কিছু অভিযোগ, বিশেষ করে যৌন সহিংসতার ঘটনাগুলোর বিস্তারিত তথ্য এখনও যাচাই করা যায়নি বা আরও তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে, যখন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনের সঙ্গে ঘটনাস্থলে থাকা সাংবাদিকদের প্রতিবেদনগুলোয় পার্থক্য দেখা গেছে, তখন এসব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের প্রকৃত মাত্রা নির্ধারণ করা কঠিন হয়েছে। এ ছাড়া, ওএইচসিএইচআরের হাতে আসা কিছু অভিযোগ দূরবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছে এবং সেখানকার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং উপায়ের সীমাবদ্ধতা ছিল।

২৩০. সাক্ষাৎকারদাতাদের থেকে পাওয়া তথ্য ইঙ্গিত দেয়, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হামলার একটি বিস্তৃত ধারা রয়েছে, যা ধর্মীয়, জাতিগত ও রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক চিন্তাধারার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে। এসব ঘটনাগুলোর মধ্যে সম্পত্তি ধ্বংস এবং স্বতন্ত্র পরিচয় দমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং থানাগুলো দখলের ফলে ক্ষমতার শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠী, বিশেষ করে হিন্দু, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী গোষ্ঠী এবং আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় আরও বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হামলাগুলো চালানো হয়েছে, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং যেখানে ধর্মীয় ও জাতিগত বৈষম্য, সংখ্যালঘুদের মধ্যে থাকা আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা, স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ওএইচসিএইচআর স্বীকার করেছে যে, ভুল তথ্য অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা ও প্রেক্ষাপটকে বিভ্রান্ত করেছে, যা এসব ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশে যাচাই করা সূত্রের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

BANGLA NEWS24.com

২৩১. উপরে বর্ণিত সীমাবদ্ধতার পরও, ওএইচসিএইচআর পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে, যেগুলো থেকে নিম্নলিখিত মূল ধরনগুলো বেরিয়ে আসে, যা আরও তদন্তের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

হিন্দুদের বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে হামলা এবং বাস্তুচ্যুতি

২৩২. আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয়ের ওপর ব্যাপক হামলা হয়। বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট এবং দিনাজপুরের মতো গ্রামীণ ও ঐতিহাসিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ এলাকায় ওই ধরনের হামলা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তবে সিলেট, খুলনা ও রংপুরসহ অন্যান্য স্থানেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ বিশেষ করে আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে করা হয় এমন এলাকায় ব্যাপক ছিল, কারণ হিন্দুরা প্রায়শই এই রাজনৈতিক দলটির সাথে যুক্ত ছিল বলে ধরা হয়।

২৩৩. ওএইচসিএইচআর ওইসব এলাকার কিছু হিন্দু ব্যবসায়ী ও গৃহস্থের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তারা জানিয়েছেন, তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর, জমি ও উপাসনালয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। হিন্দু মালিকানাধীন দোকানপাট লুটপাটও করা হয়েছে। ওইসব সহিংসতায় সম্পত্তি ধ্বংস, অগ্নিসংযোগ ও শারীরিক হুমকির ঘটনা ছিল। সেই সাথে পুলিশের অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ার কারণে কাঠামোগত দায়মুক্তি ও সম্ভাব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারদাতা জানান, ঠাকুরগাঁওয়ে হিন্দুদের শ্মশান ও মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। অন্য কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বিষয়সম্পত্তির ওপর হামলার পর প্রায় ৩ থেকে ৪ হাজার হিন্দু সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক সহিংসতার আশঙ্কায় ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ তাদের ফিরিয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ব্যাপক অনিরাপত্তা অনুভব করেছে এবং তাদের অনেকেই আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, কারণ তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী, গবাদিপশু এবং পুরো ব্যবসা হারিয়েছে।

২৩৪. প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের বক্তব্য থেকে জানা গেছে, এসব হামলার অধিকাংশই ‘বিজয় মিছিল’ নামে কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংঘটিত হয়েছে, যা সাবেক সরকারের পতন উদযাপনের জন্য আয়োজিত হয়েছিল। যদিও হামলাকারীদের পরিচয় সব ক্ষেত্রে পরিষ্কার নয়। তবে কিছু প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, হামলাকারীদের মধ্যে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য সংগঠিত গোষ্ঠীর স্থানীয় সমর্থকরা ছিল। তবে, এই রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকেও এসব হামলার নিন্দা জানানো হয়েছে। ৬ আগস্টের পর, স্থানীয় পর্যায়ে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ছাত্র সংগঠন এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে হিন্দুদের বাড়িঘর ও উপাসনালয় রক্ষার চেষ্টা চালানো হয়। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতাদের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সহিংসতার নিন্দা জানিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন।

BANGLA NEWS24.com

২৩৫. বিক্ষোভরত জনতা হিন্দু প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের জোর করে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, এমন একাধিক অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর বক্তব্য অনুযায়ী, হামলাকারীদের মধ্যে স্থানীয় বিএনপি নেতারাও ছিলেন।

২৩৬. অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে ওএইচসিএইচআরকে সরবরাহ করা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার এনএসআই'র তথ্য অনুযায়ী, ৫ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে ৩৭টি সহিংস হামলার ঘটনা ঘটে। এসব হামলা যশোর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, নাটোর, দিনাজপুর, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, মেহেরপুর, বরগুনা, বরিশাল, রাজবাড়ী, ঠাকুরগাঁও, ফরিদপুর, পিরোজপুর ও নেত্রকোনায় সংঘটিত হয়। বেশিরভাগ ঘটনায় এক বা একাধিক বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লুটপাট, ধ্বংস বা অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে। চারটি হামলা মন্দিরকে লক্ষ্য করে চালানো হয়। কিছু ঘটনায় ভুক্তভোগীদের শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, যার মধ্যে এক নারীর গলা কেটে ফেলা হয় এবং এক লোককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আহত করা হয়। চিহ্নিত ভুক্তভোগীদের মধ্যে নয়জন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাঁচটি হামলার ক্ষেত্রে, এনএসআই প্রতিবেদনে বিএনপি সমর্থকদের হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, বাংলাদেশ পুলিশ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে ৪ থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের রিপোর্ট করা সংখ্যালঘুদের ওপর ১ হাজার ৭৬৯টি হামলা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করা হয়। পুলিশের অনুসন্ধান অনুযায়ী, এসব ঘটনার মধ্যে ১ হাজার ২৩৪টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, ২০টি সাম্প্রদায়িক কারণে ঘটেছিল এবং ১৬১টি মিথ্যা অভিযোগ ছিল।

আহমদিয়া মুসলিমদের ওপর হামলা

২৩৭. আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের বৃহত্তর মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। তবে অন্যান্য ইসলামি বিশ্বাস অনুসারীদের মধ্যে কিছু গোষ্ঠী আহমদিয়াদের প্রতি বৈরিতা ও বৈষম্য করে আসছে। বিক্ষোভ-পরবর্তী সহিংসতায় এই সম্প্রদায়কে টার্গেট করে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে ৫ থেকে ৯ আগস্টের মধ্যে সাতটি হামলার অভিযোগ পাওয়া যায়। ওএইচসিএইচআর বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারে যে, ৫ আগস্ট পঞ্চগড় জেলায় ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে একটি দল আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন সদস্যের ওপর হামলা চালায় এবং ১১৭টি বাড়িঘর ও একটি মসজিদ ধ্বংস করে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য সম্পত্তির ক্ষতি হয়। ওএইচসিএইচআর একটি ১৬ বছর বয়সী কিশোরের ঘটনাও নথিভুক্ত করেছে, যে ৫ আগস্টের পঞ্চগড় হামলায় গুরুতর আহত হয়। হামলার পর তার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করতে হয় এবং তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। পরে সে ওই আঘাতের কারণে মারা যায়। ওএইচসিএইচআর এ বিষয়ে কোনো সরকারি পদক্ষেপের খবর পায়নি, বিশেষ করে ওই কিশোরের হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনো জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে

BANGLA NEWS24.com

কোনো তথ্য নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন

২৩৮. পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ এবং সমতল এলাকা থেকে বাঙালিদের পাহাড়ে স্থানান্তরের নীতিগুলো, যা প্রায়শই সামরিক বাহিনীর সমর্থনে হয়ে থাকে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে ফেলেছে এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থাগুলো ওই গোষ্ঠীগুলোকে আদিবাসী হিসেবে বিবেচনা করে। তবে বাংলাদেশ সরকার 'আদিবাসী' শব্দটি স্বীকার করে না এবং সংবিধান অনুযায়ী তাদের জাতিগত সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি এবং সামরিক উপস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ সংঘাত এখনো অব্যাহত রয়েছে। অস্থিরতা থামার পরেও, আদিবাসী জনগণ বাঙালিদের হাতে হয়রানির শিকার হয়, বিশেষ করে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী সরকারের প্রতি আনুগত্যের অভিযোগ ওঠে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যা কোটা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিক্ষোভের পাশাপাশি বিভ্রান্তিকর প্রচারণার মাধ্যমে আরও তীব্র হয়। এসব প্রচারণার মধ্যে একটি মিথ্যা দাবি ছিল যে, একজন বাঙালি শিক্ষার্থীকে ভর্তি থেকে বঞ্চিত করে তার পরিবর্তে একজন আদিবাসী শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়েছে, কিন্তু সত্য হলো–দুজনই ভর্তি হয়েছিল। এই ধরনের ঘৃণাভরা বক্তব্য ছড়ানোর পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি গোষ্ঠীগুলো ভয়ভীতি প্রদর্শনের প্রচেষ্টা বেড়ে যাওয়ার পেছনে কিছু ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর সম্পৃক্ততা ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। বিক্ষোভের সময় এবং ৫ আগস্টের পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় ইস্যুগুলোকে কেন্দ্র করে আন্দোলন-সংগ্রাম এবং গ্রাফিতি এঁকে প্রচারাভিযান চলেছে। এসবের মধ্যে সামরিকীকরণ হ্রাসের দাবি ছিল। প্রতিক্রিয়ায় সামরিক বাহিনী সেই গ্রাফিতিগুলো মুছে ফেলে এবং প্রতিবাদ দমন করতে কর্মীদের আটক করে। এসব পদক্ষেপ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করে, ফলে তাদের আরও সংগঠিত হওয়ার ইচ্ছা দমে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ৫ আগস্ট বান্দরবানে সহিংসতা তীব্র হয়ে ওঠে, যেখানে আদিবাসী ও বাঙালি সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিক্ষোভে অংশ নেয়। কিছু সশস্ত্র বাঙালি ট্রাকে করে এসে স্থানীয় এক সংসদ সদস্যের বাসভবনে হামলা চালায় এবং একজন আদিবাসীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

মন্দির, মসজিদ, মাজার ও অন্যান্য উপাসনালয়ে হামলা

২৩৯. বাংলাদেশে ধর্মীয় স্থাপনা, বিশেষ করে মন্দির ও মাজারে হামলার দীর্ঘদিনের রেকর্ড রয়েছে। এই প্রতিবেদনে আলোচিত সময়কালে, ৫ থেকে ১৫ আগস্টের মধ্যে, বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু, আহমদিয়া, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপাসনালয়গুলোয় হামলার ঘটনা গণমাধ্যম ও স্থানীয় সূত্রে পাওয়া গেছে। ওএইচসিএইচআরে জমা পড়া তথ্য অনুযায়ী, লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধার বুরাশারদুবি এলাকায় তিনটি মন্দিরে হামলা চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রায় ২০টি বাড়ি লুটপাট করা হয়, যা এসব স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে চরম অস্থিরতার প্রতিফলন। মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ইসকনের একটি মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ওএইচসিএইচআর-এর কাছে রিপোর্ট

BANGLA NEWS 24 .com

করা নির্দিষ্ট ঘটনাগুলোও এই আক্রমণগুলো ঘিরে জটিলতার ওপর জোর দেয়। উদাহরণস্বরূপ, ৭ আগস্ট নন্দীপাড়ার কালী মন্দিরে আক্রমণ করা হয়েছিল, কিন্তু তদন্তের পর স্পষ্ট হয় যে, ক্ষতির কারণ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নয়, বরং জমির মালিকানা নিয়ে স্থানীয় বিরোধ।

যৌন সহিংসতার অভিযোগ

২৪০. ওএইচসিএইচআর ৫ আগস্টের পর বিশেষত ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর নারীদের বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার অভিযোগ সম্পর্কিত পরোক্ষ প্রতিবেদন পেয়েছে। তবে, ব্যাপক চেষ্টা চালিয়েও ওএইচসিএইচআর প্রাথমিক সাক্ষ্যগ্রহণ করতে পারেনি, অভিযোগগুলোর সাথে অতিরিক্ত তথ্য সংযুক্ত করতে পারেনি বা নির্দিষ্ট তারিখ নিশ্চিত করতে পারেনি। ভুক্তভোগীরা প্রতিশোধ বা সামাজিকভাবে একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে আসতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ছিলেন। এমন নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ এবং প্রত্যন্ত এলাকায় যাওয়া কঠিন হওয়ার কারণে, তদন্ত পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভুক্তভোগী যখন প্রতিবন্ধী, বা যেখানে মূল যোগাযোগকারী তাদের নিকটাত্মীয় যেমন বাবা বা স্বামী, সেখানে ভুক্তভোগীদের সম্মতি বা গোপন সাক্ষাৎকার গ্রহণ কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। কারণ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো ওএইচসিএইচআরের পক্ষে ভুক্তভোগীদের মানসিক আঘাত আমলে নিয়ে এবং তাদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিস্তারিত তদন্ত পরিচালনা কঠিন করে তোলে। তবে, এই ধরনের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি যৌন সহিংসতার ঘটনাগুলোর প্রতিবেদন তৈরিতে থাকা উল্লেখযোগ্য বাধাগুলো তুলে ধরে, যা বড় আকারে দায়মুক্তির পথ খোলা রাখে।

BANGLA NEWS 24.com

২৪১. আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থার ভাঙন এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় চলমান সংকট ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আর অন্যান্য লঙ্ঘনকে সহজতর করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাড়া খুবই অপর্যাপ্ত বলে সমালোচিত হয়েছে এবং তাদের কাছে করা অভিযোগ প্রায়শই খারিজ করা হয়েছে বা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশ্যে জানিয়েছে যে, ৪ আগস্টের পর সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সঙ্গে সম্পর্কিত ১১৫টি মামলার ভিত্তিতে অন্তত ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২৪২. ১৫ আগস্টের পরও ওএইচসিএইচআর ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের ওপর হামলা ও নিপীড়নের প্রতিবেদন পেতে থাকে এবং সুপারিশ করে যে, এ ধরনের সমস্ত অভিযোগ দ্রুত এবং স্বাধীনভাবে তদন্ত করা হোক।

VII. জবাবদিহিতার প্রচেষ্টা

২৪৩. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাথে সম্মত পরামর্শের শর্তানুযায়ী, ওএইচসিএইচআর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নির্যাতনের জন্য এখন পর্যন্ত গৃহীত ব্যবস্থার মূল্যায়ন করেছে।

২৪৪. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করতে বাধ্য, যার দায় রাষ্ট্রের ওপর আরোপ করা যায়। এসব প্রতিকারের মধ্যে আছে ফৌজদারি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দ্রুত, যথাযথ এবং কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং এই ধরনের লঙ্ঘন আবারও যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করা। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বেআইনি জীবননাশ, নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দ্রুত, সম্পূর্ণ, কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বচ্ছ তদন্তের আওতায় আনতে হবে, যা দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করতে সক্ষম হবে। এ ধরনের তদন্ত শুরুর জন্য ভুক্তভোগী বা তাদের পরিবার অভিযোগ করেছে কি না তা বিবেচনা করা উচিত নয় (পদাধিকারবলে)। এ ছাড়াও, যখন রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বা আইন প্রয়োগের পরিস্থিতিতে মৃত্যু বা গুরুতর আহত করার ঘটনা ঘটান, তখন নির্দিষ্টভাবে অবৈধ কর্মকাণ্ডের অভিযোগ না তোলা হলেও তা যথাযথভাবে তদন্ত করা দরকার।

১. ৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রকৃত কোনো জবাবদিহিতামূলক প্রচেষ্টা ছিল না

BANGLA NEWS 24 .com

২৪৫. ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে আগের সরকারের কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত গুরুতর লঙ্ঘন ও নির্যাতনের জন্য তদন্ত করেছে, এমন কোনো উদ্যোগের প্রমাণ ওএইচসিএইচআর খুঁজে পায়নি। বরং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার কোনো উদ্যোগও আগের সরকারের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেনি।

২৪৬. যদিও বাংলাদেশের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ আইন অনুযায়ীও এই ধরনের তদন্ত করা প্রয়োজন ছিল, সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন যে, সেই সময়কালে নিরাপত্তা বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কোনো তদন্ত পরিচালিত হয়নি। নির্যাতন এবং গুরুতর নিপীড়নের অভিযোগের ক্ষেত্রেও কোনো তদন্ত করা হয়নি। তখনকার কর্মকর্তারা সেইসময়ের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অস্থিরতাকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে কোনো ভুক্তভোগী আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেননি। তবে, দেশি-বিদেশি নির্ভরযোগ্য সংবাদমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রকাশিত অসংখ্য প্রতিবেদন এই অভিযোগগুলোর তদন্ত নিজ উদ্যোগে শুরু করার জন্য কারণ হিসেবে যথেষ্ট ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন ভঙ্গ নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিল। কমপক্ষে একবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিদেশি ও বিশ্বনেতাদের উদ্বেগ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এ ছাড়া, আরেকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আগস্টের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

২৪৭. ১৭ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তিন বিচারকের নেতৃত্বে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের ঘোষণা দেন, তবে সকল সহিংস ঘটনার জন্য 'বিরোধী দলের উসকানি' এবং 'সন্ত্রাসবাদীদের' দায়ী করেন। এই তদন্ত কমিশনের কাজ ছিল কেবল 'কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের কারণে ঘটা মৃত্যু, সহিংসতা, ভাঙচুর,

অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড’ তদন্ত করা, যা মূলত আন্দোলনকারীদের কর্মকাণ্ডের ওপরই কেন্দ্রীভূত ছিল এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক সহিংসতার কোনো উল্লেখ ছিল না। একজন সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং অন্য এক কর্মকর্তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে, এই তদন্ত কমিশন কোনো অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট বা অনুসন্ধান প্রকাশ করেনি, এমনকি ৫ আগস্ট যখন এটি কাজ বন্ধ করে দেয় তখন এর কার্যক্রমের কোনো রেকর্ডও রাখেনি।

২৪৮. দায়বদ্ধতা নিশ্চিত না করে কর্তৃপক্ষ মানবাধিকার লঙ্ঘনের সত্য গোপন করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যেসব হাসপাতালে অনেক ভুক্তভোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন, সেইসব স্থানে ডিজিএফআই, এনএসআই, গোয়েন্দা শাখা এবং অন্যান্য পুলিশ সংস্থা উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণসহ রেকর্ড বাজেয়াপ্ত করেছে। পুলিশ কিছু ক্ষেত্রে লাশ হাসপাতালে থেকে নিয়ে গেছে, লাশ গোপন করেছে বা পুড়িয়ে ফেলেছে, যা হত্যাকাণ্ড লুকানোর প্রচেষ্টা হিসেবে সামনে এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের শরীর থেকে গুলি বের করে তা কোনো রেকর্ড ছাড়াই পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ওএইচসিএইচআর জানতে পেরেছে যে, পুলিশ এবং র‌্যাব ইউনিটগুলিকে রেকর্ডবিহীনভাবে গোলাবারুদ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, যেন অতিরিক্ত গুলি ছোড়ার বিষয়টি গুলি খরচের হিসেবে ধরা না পড়ে। র‌্যাব দাবি করেছে যে, তাদের ১৫টি মোতায়েনকৃত ব্যাটালিয়নের মধ্যে ১৪টি ব্যাটালিয়ন কোনো গুলি চালায়নি। এমন দাবি ওএইচসিএইচআর-এর সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কারণ বিভিন্ন স্থানে র‌্যাবের গুলিবর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২৪৯. ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং অন্যান্য যারা জবাবদিহিতার দাবি তুলেছিলেন বা নিরাপত্তা বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, ওইসব ব্যক্তিদের পুলিশ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ভয়ভীতি দেখিয়েছে। বিশেষ কিছু হাই-প্রোফাইল হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে, ডিজিএফআই এজেন্টরা ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্য ও আইনজীবীদের ফোন করে বা ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে।

২৫০. কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা বাহিনীর আইন ভঙ্গের ঘটনাগুলো গোপন করতে অন্যদের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। বিশেষত, আবু সাঈদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শত শত নিরপরাধ ব্যক্তিকে ভুলভাবে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। অথচ প্রকাশিত ভিডিও ফুটেজ আর অন্যান্য প্রমাণে স্পষ্ট ছিল যে পুলিশই তাকে হত্যা করেছে। এমন সুস্পষ্ট হত্যাকাণ্ড এবং নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে আহত হওয়ার ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভুলভাবে বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের দোষারোপ করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেন।

২৫১. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার নিজস্ব ক্ষমতার মধ্যে থেকেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়। ৩০ জুলাই কমিশন একটি অস্পষ্ট বিবৃতি দেয়, যেখানে প্রাণহানিকে ‘খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন’ বলে উল্লেখ করে এবং কর্তৃপক্ষকে গণগ্রেপ্তার না করার আহ্বান জানায়। তবে, ৫ আগস্ট পর্যন্ত

কমিশন আর কোনো প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করেনি বা কোনো তদন্ত শুরু করেনি বলে ওএইচসিএইচআর যতটা সম্ভব নিশ্চিত হতে পেরেছে।

২. অন্তর্বর্তী সরকারের জবাবদিহিতার প্রচেষ্টা

২৫২. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এখন পর্যন্ত তারা মূলত দ্রুততম সময়ে অপরাধমূলক মামলাগুলোকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এটি একটি অভ্যন্তরীণ আদালত, যা মূলত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত কথিত আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার করার জন্য ২০০৯ সালে শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ১৯৭৩ সালে গৃহীত আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা ২০২৪ এর নভেম্বরে সংশোধন করা হয়। ২০১০-এর দশকের শুরুতে, জামায়াতে ইসলামীর বেশ কয়েকজন নেতাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ছয়জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সেই সময় ওএইচসিএইচআর এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থাগুলো মনে করে, এই বিচার প্রক্রিয়া আলোচ্য বিচারের প্রকৃত পরিচালনা পদ্ধতি তথা আইসিটির প্রাসঙ্গিক কার্যপ্রণালীর যথাযথ প্রক্রিয়া এবং ন্যায্য বিচারের অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। মৃত্যুদণ্ডাদেশ, যেকোনো পরিস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের বিপরীতে জাতিসংঘের নীতিগত অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক।

BANGLA NEWS 24 .com

২৫৩. ৭ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর হিসেবে কয়েকজন আইনজীবীকে নিয়োগ দেয়, যারা শেখ হাসিনার সরকারের সময় অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এরপর অক্টোবর মাসে, প্রসিকিউশন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ৪৬ জন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং অন্যান্য সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১৭ জন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ গঠন করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এদের মধ্যে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাকিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।

২৫৪. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অতীত বিতর্কিত ইতিহাস, আইনি কাঠামো এবং সরকার পরিবর্তনের পরেও এর সত্যিকারের স্বাধীন ও ন্যায়সংগত বিচার পরিচালনার সক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ আছে বিধায় মানবাধিকার কর্মী এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইনজীবীসহ অনেক পর্যবেক্ষক এই বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ওএইচসিএইচআর-এর কাছে তথ্য এসেছে যে, দ্রুত মামলা পরিচালনা করে জনসাধারণের ন্যায়বিচারের দাবিতে সাড়া দিতে আইসিটির প্রসিকিউটরদের ওপর চাপ রয়েছে, যদিও তাদের তদন্ত, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সাক্ষীদের সুরক্ষা ও সুষ্ঠু বিচার পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত সংস্থান ও সক্ষমতা নেই। কিছু পর্যবেক্ষক মনে করেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এড়াতে এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে, পরিস্থিতিটি রাষ্ট্রীয়ভাবে হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) অর্পণ করা হলে ভালো হতো।

২৫৫. অন্তর্বর্তী সরকার সম্প্রতি আইসিটি আইনের সংশোধনীগুলো অনুমোদন করেছে, যা ন্যায়বিচার ও যথাযথ প্রক্রিয়ার বিষয়ে উত্থাপিত কিছু উদ্বেগের সমাধান করেছে। ওএইচসিএইচআর এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো যে বিষয়গুলো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল, তার কিছুটা এতে সমাধান হয়েছে, যেমন প্রসিকিউশনের প্রমাণ উপস্থাপনের পর থেকে বিচার শুরুর মধ্যবর্তী সময় বাড়ানো হয়েছে। তবে, এখনও কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, আইসিটি আইন এখনও এই বিধান রাখে যে ট্রাইব্যুনাল “বিচারের যে কোনো পর্যায়ে, পূর্বে কোনো সতর্কতা ছাড়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যেকোনো প্রশ্ন করতে পারেন, যা ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজনীয় মনে করেন” এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি উত্তর দিতে অস্বীকার করেন তবে তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। এটি স্পষ্টতই আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তির (আইসিসিপিআর) ১৪(৩) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। আইসিটি আইন অনুপস্থিতিতে বিচার পরিচালনার অনুমতি দিলেও, এতে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা নেই। সংশোধিত আইনেও ট্রাইব্যুনালকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ইতিবাচক দিক হলো, সরকার ওএইচসিএইচআরকে জানিয়েছে যে, প্রয়োজন হলে তারা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইন আরও সংশোধন করতে প্রস্তুত। এই তথ্য-অনুসন্ধানের জন্য রেফারেন্সের শর্তাবলীতে ওএইচসিএইচআর অন্তর্বর্তী সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে যে, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত নীতির ভিত্তিতে, ওএইচসিএইচআর কোনো ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পারে না, যদি সেটিতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকে বা যদি এতে ন্যায়বিচার, যথাযথ প্রক্রিয়া বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের গুরুতর লঙ্ঘনের বিষয়টি দেখা যায়।

BANGLA NEWS 24 .com

২৫৬. পুলিশ কর্মকর্তাদের এবং আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো প্রচলিত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আওতায় বিচারাধীন রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক, ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা শাখার সাবেক প্রধান এবং এনটিএমসি’র সাবেক মহাপরিচালক। তবে সেনাবাহিনী, ডিজিএফআই বা এনএসআইতে কর্মরত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কোনো মামলা চলমান আছে কি না, সে বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ওএইচসিএইচআরকে ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১১৮১টি চলমান তদন্তে মোট ৪৫৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা অভিযুক্ত, যার মধ্যে ২৫৯ জন সিনিয়র কর্মকর্তা। ৩৫ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ১৬৩ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বিজিবি ওএইচসিএইচআরকে জানিয়েছে যে, তারা বিজিবির গুলিবর্ষণের সমস্ত ঘটনাই বিভাগীয় তদন্ত শেষ করেছে এবং ‘বিচার প্রক্রিয়া চলমান’, তবে তারা এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি। বিজিবি আরও জানিয়েছে যে, দুইজন মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাকে শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওএইচসিএইচআরকে র‍্যাব জানিয়েছে যে, আটজন র‍্যাব কর্মকর্তাকে তাদের নিজ নিজ সংস্থায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। কিছু র‍্যাব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চলছে, যদিও তারা বিস্তারিত তথ্য দেয়নি এবং দাবি করেছে যে, র‍্যাব ‘অবৈধ বা মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক কোনো কার্যকলাপে অংশ নেয়নি’। ডিজিএফআই, আনসার/ভিডিপি এবং এনএসআইয়ের

কোনো তদন্ত বা জবাবদিহিতা সংক্রান্ত পদক্ষেপের তথ্য পাওয়া যায়নি।

২৫৭. আইনজীবী ও অন্যান্য সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় মামলার অগ্রগতি ধীর। অতীতের দুর্বল নিয়ম অনুসরণ করে ভুক্তভোগীরা রাজনৈতিক চাপের মুখে ব্যাপক সংখ্যক ফৌজদারি অভিযোগ দাখিল করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশও বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করেছে। পুলিশের তথ্যমতে, ১ হাজার ১৮১টি চলমান তদন্তে মোট ৯৮ হাজার ১৩৭ জন অভিযুক্ত, যাদের মধ্যে ২৫ হাজার ৩৩ জন রাজনৈতিক দলের নেতা। অর্থাৎ, প্রতিটি মামলায় গড়ে ৮৪ জন অভিযুক্ত, যার মধ্যে ২১ জন করে রাজনৈতিক নেতা রয়েছেন। এ ধরনের ব্যাপক মামলার ফলে অনেক ব্যক্তিকে আইনত অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত না থাকা সত্ত্বেও তদন্ত বা গ্রেপ্তারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সীমিত তদন্ত ও বিচারিক ক্ষমতা ন্যায়বিচারের জন্য প্রকৃত দায়ীদের বিরুদ্ধে কার্যকর মামলার প্রস্তুতিতে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ওএইচসিএইচআর বেশ কিছু পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছে, যেখানে সুস্পষ্ট বেআইনি জীবননাশের তথ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়নি বা জনসাধারণের চাপের মুখে দেরিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২৫৮. সফল বিচারব্যবস্থা ধরে রাখতে কার্যকর তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থা এখনও কম। পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে জড়িত ফৌজদারি অভিযোগ তদন্তের জন্য বাংলাদেশে কার্যকর এবং স্বাধীন ব্যবস্থার অভাব থাকায়, পুলিশ তাদের বর্তমান বা সাবেক সহকর্মীদের বিরুদ্ধে চলমান মামলাগুলো যথাযথভাবে তদন্ত করবে কি না, তা নিয়ে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত দলও সম্পূর্ণরূপে কর্মরত বা সাবেক পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভরশীল বলে জানা গেছে।

BANGLA NEWS 24 .com

২৫৯. নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ স্তরের ঠিক নিচের পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা এখনও তাদের পদে বহাল রয়েছেন, যারা এই প্রতিবেদনে বর্ণিত অপরাধমূলক আচরণের তদন্ত এবং প্রসিকিউসনের মাধ্যমে সরাসরি প্রভাবিত হতে পারেন। ওএইচসিএইচআর তথ্য পেয়েছে যে, নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার, সাক্ষী ও আইনজীবীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন, যদিও ৫ আগস্টের আগের তুলনায় এসব ঘটনা প্রকাশ্যে কম ঘটছে। অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জানাশোনা এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, নিরাপত্তা কর্মকর্তারা নির্যাতন কেন্দ্রের প্রমাণ ধ্বংস করতে চেয়েছেন। বিক্ষোভ-পরবর্তী সময়ে জুলাই মাসে পুলিশের গুলিতে নিহত এক ব্যক্তির পরিবারের কাছে অভিযুক্ত কর্মকর্তার এক আত্মীয় ভয় দেখাতে গিয়েছিলেন এবং গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা তাদের আইনজীবীর ওপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। অপর এক পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়, ডিবি পুলিশের একটি দল ভিকটিমের পরিবারের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়েছে। বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ, বিশেষত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এখনো কোনো সাক্ষী সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করেনি, ফলে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযুক্ত সদস্যরা সহজেই ভুক্তভোগী ও প্রধান সাক্ষীদের ভয় দেখাতে পারছেন।

২৬০. এ ছাড়া, অভিযুক্তদের আইনজীবীদের ওপর অযাচিত চাপ সৃষ্টি নিয়ে উদ্বেগ

রয়েছে। কিছু আইনজীবীকে আদালতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার পাশাপাশি হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মক্কেলের সাথে যোগাযোগ বা মামলার নথি পাওয়ার অনুমতি সীমিত করা হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গেছে। সরকার ওএইচসিএইচআরকে জানিয়েছে যে, অনেক আইনজীবী, যারা সাধারণত সাবেক সরকার ও আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টদের পক্ষে মামলা লড়তেন, তারা দেশ ছেড়েছেন বা আদালতে উপস্থিত হচ্ছেন না, তবে বাংলাদেশে একটি আইনি সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে, যা অভিযুক্তের পক্ষে কোনো আইনজীবী না থাকলে তাদের জন্য আইনগত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

২৬১. কারো দ্বারা গুরুতর নির্যাতনের প্রকৃত ঝুঁকি থেকে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে মানবাধিকারের বাধ্যবাধকতা অনুসারে, অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্যই আওয়ামী লীগ সমর্থক, পুলিশ কর্মকর্তা বা নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের লক্ষ্য করে সংঘটিত সহিংস অপরাধগুলো দ্রুত এবং স্বাধীনভাবে যথাযথ সতর্কতার সাথে তদন্ত করবে এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনবে। ওএইচসিএইচআর এই বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের জবাবদিহিতামূলক প্রচেষ্টার বিষয়ে তথ্য চাইলেও, তা এখনও সরবরাহ করা হয়নি। তবে সরকার প্রকাশ্যে জানিয়েছে যে, সংখ্যালঘুদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় অন্তত ১০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে আওয়ামী লীগ সমর্থক বা পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ঘটনায় মোট কতজন গ্রেপ্তার হয়েছেন, সে বিষয়ে সরকার এখনও কোনো বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি।

BANGLA NEWS 24 .com

২৬২. প্রতিশোধমূলক সহিংসতা ও নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও আদিবাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যারা অপরাধ ঘটিয়েছে, তাদের অনেকেই এখনো দায়মুক্তি উপভোগ করছে বলে মনে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে, ওএইচসিএইচআর অন্তবর্তী সরকারের একটি ঘোষণার কথা উল্লেখ করেছে, যেখানে জানানো হয় যে, ১৪ অক্টোবর ২০২৪-এ জারি করা এক আদেশ অনুযায়ী, 'যেসব শিক্ষার্থী ও নাগরিক এই অভ্যুত্থানকে সফল করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, তারা ১৫ জুলাই থেকে ৮ আগস্টের মধ্যে সংঘটিত তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো ধরনের মামলা, গ্রেপ্তার বা হয়রানির শিকার হবেন না'। এই ঘোষণা প্রসঙ্গে সরকার ওএইচসিএইচআরকে জানিয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট সহিংসতার বেশিরভাগই 'নিরুপায় আত্মরক্ষার অংশ হিসেবে বা চরম উসকানির জবাবে' ঘটেছে এবং তাদের মতে, এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকার আরও বলেছে যে, এই পরিস্থিতিতে বিচারের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো হলে পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে, জাতিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে এবং জাতীয় ঐক্য দ্রুত হবে। তবে, মানবাধিকার সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, জীবন ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রক্ষা এবং লিঙ্গ, জাতিগত পরিচয় বা ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এ কারণে, ওএইচসিএইচআর মনে করে যে, অন্তত জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ, যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, গুরুতর হামলা, বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং জাতিগত, ধর্মীয় বা লিঙ্গভিত্তিক বিদ্বেষ থেকে সংঘটিত অপরাধগুলো কোনোভাবেই সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা উচিত নয়। এ ছাড়া, বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পত্তির ধ্বংস বা লুটপাটের শিকার ব্যক্তিরাও তাদের নাগরিক মামলা দায়েরের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়। যথাযথ আইনি আত্মরক্ষার বিধান থাকলেও, এটি কোনোভাবেই বিচার থেকে সাধারণভাবে

অব্যাহতি পাওয়ার যৌক্তিকতা হতে পারে না। ওএইচসিএইচআর আরও মনে করে যে, নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত বিচার ব্যবস্থা বজায় রাখা হলে জাতীয় ঐক্য এবং স্থিতিশীলতা আরও কার্যকরভাবে অর্জিত হতে পারে।

২৬৩. অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার পাশাপাশি, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকারদের জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রতিকার নিশ্চিত করাও জরুরি। এর মধ্যে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদানও আছে। কারণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে অনেক ভুক্তভোগীর পরিবার চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক পরিবার তাদের উপার্জনক্ষম সদস্যকে হারিয়েছে। অনেক ভুক্তভোগী স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন, ফলে তারা জীবিকা অর্জন করতে পারছেন না। পুলিশের ছোড়া ধাতব গুলিতে অন্ধ হয়ে যাওয়া এক ব্যক্তি বলেছেন, 'আমরা দান-খয়রাত চাই না, আমরা চাই সরকার আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক, কারণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে আমরা আমাদের চাকরি হারিয়েছি'। ১৭ আগস্ট, অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা করে যে, বিক্ষোভের সময় আহতদের চিকিৎসা ব্যয় সরকার বহন করবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানা গেছে। সেপ্টেম্বরে সরকার 'শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল বিক্ষোভ চলাকালে নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য সহায়তা দেওয়া। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ, সরকার জানায় যে, নিহত ও আহতদের পরিবারকে মোট ৪৮ কোটি টাকা (প্রায় ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সরকার আরও ঘোষণা করে যে, আহত ও নিহতদের পরিবারের জন্য অতিরিক্ত ৬৩৮ কোটি টাকা (প্রায় ৫২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) সহায়তা দেওয়া হবে।

BANGLA NEWS 24.com

২৬৪. এ ছাড়াও, অন্তর্বর্তী সরকার বিক্ষোভে নিহতদের স্মরণে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে শহীদদের নামে খেলার মাঠ ও ক্রীড়া স্টেডিয়ামের নামকরণ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'অভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা। এসবের উদ্দেশ্য, বিক্ষোভের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ করা। বিক্ষোভ আন্দোলনের স্মরণে চিত্রকলা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনের জন্য সুশীল সমাজের বিভিন্ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের মানসিক ক্ষত নিরাময়ে 'হিলিং সার্কেল' প্রতিষ্ঠার মতো উদ্যোগেও ভুক্তভোগী ও সুশীল সমাজ নেতৃত্ব দিয়েছে।

২৬৫. অপরাধের দায়মুক্তি ও গুরুতর সহিংসতার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার জেরে ২০২৪ এর বিক্ষোভে সংগঠিত আইন লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহের ওপর আলোকপাত করতে অন্তর্বর্তী সরকার কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল ব্যক্তিকে গুমের হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়ার আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদন করা, সংশোধিত ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন অনুযায়ী গুমকে একটি অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং গুমের ঘটনা তদন্তের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিশন গঠন করা। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪-এ কমিশন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে তার অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন পেশ করে। এরই মধ্যে ৭৫৮টি গুমের ঘটনা যাচাই করে কমিশন দেখতে পায় যে, র‍্যাব, ডিবি, কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) শাখা এবং ডিজিএফআই গুমের ঘটনায় জড়িত ছিল। কমিশন বিশেষভাবে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন

(র‍্যাব) ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেছে।

VIII. আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় সংক্রান্ত অনুসন্ধান

২৬৬. এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সকল তথ্যের গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ওএইচসিএইচআর মনে করে যে, ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে সাবেক সরকার এবং তার নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা, আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত সহিংস গোষ্ঠীগুলোর সহযোগিতায় পরিকল্পিতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন চালিয়েছে। এসব আইন ভঙ্গের ঘটনা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা খাতের শীর্ষ কর্মকর্তাদের জ্ঞাতসারে, সমন্বয়ে ও নির্দেশনায় ঘটেছে।

২৬৭. সাবেক সরকারের মাধ্যমে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার লঙ্ঘন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ থেকে মুক্ত থাকার অধিকার লঙ্ঘন, আটক ব্যক্তিদের প্রতি মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণের অধিকার লঙ্ঘন, ন্যায়বিচারের অধিকার লঙ্ঘন, গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন, মতামত ও প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্যহীনতার অধিকার লঙ্ঘন, সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার লঙ্ঘন, শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিকার পাওয়ার অধিকার লঙ্ঘন।

BANGLA NEWS 24.com

২৬৮. বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কিছু স্থানীয় নেতা ও সমর্থকও প্রতিশোধমূলক হামলার সময় সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী, যার মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের লক্ষ্য করে চালানো নির্যাতনও রয়েছে।

২৬৯. অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হলো, ওই সময়কালে সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও প্রতিশোধমূলক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করা। এর মধ্যে আছে, আন্তর্জাতিক মান অনুসারে এসব অপরাধের সম্পূর্ণ তদন্ত ও সত্য উদঘাটন, অপরাধীদের দায়বদ্ধতার আওতায় আনা, ভুক্তভোগীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আইন ভঙ্গ ও নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করা।

১. সাবেক সরকার ও আওয়ামী লীগ

২৭০. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও সশস্ত্র আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়নের ঘটনা ছিল যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা, যার জন্য আন্দোলন দমনে বেআইনি উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। জুলাইয়ের প্রথম দিক থেকেই সাবেক সরকার ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ধরেই নিয়েছিল যে, এই আন্দোলনে তাদের রাজনৈতিক বিরোধীরা ‘অনুপ্রবেশ’ করেছে এবং এটি তাদের অজনপ্রিয় সরকারের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড় রাজনৈতিক হুমকি হয়ে উঠতে পারে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী তার ‘রাজাকার’ মন্তব্য করার কয়েক দিন আগেই প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ছাত্র আন্দোলন সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তিনি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইকে নিয়োগ করেছিলেন। সরকারের সিনিয়র কর্মকর্তারা ও আওয়ামী লীগের নেতারা প্রকাশ্যে

তার অবস্থানকে সমর্থন করেন এবং আন্দোলনকারীদের অবৈধভাবে দমন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন, যা পরবর্তী মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্র তৈরি করে।

২৭১. মধ্য জুলাই থেকে সাবেক সরকার ও আওয়ামী লীগ আন্দোলন দমন করতে ক্রমশ সহিংস উপায়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ব্যবহার বাড়াতে থাকে। ফলে পরিকল্পিতভাবে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়, যার মধ্যে ছিল শত শত বিচারবহির্ভূত হত্যা, হাজার হাজার মানুষের গুরুতর আহত হওয়া, নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক, নির্যাতন এবং অন্যান্য অমানবিক আচরণ।

ছাত্রলীগ ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ সমর্থকরা

২৭২. আন্দোলন দমনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নৃশংস হামলা। এসব হামলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের, এমনকি কয়েকজন মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ উসকানিতে সংঘটিত হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ছাত্র আন্দোলনকারীদের 'রাজাকার' আখ্যা দেওয়ার পর ছাত্রলীগের সভাপতি ১৫ জুলাই থেকে রাস্তায় 'কোনো রাজাকার থাকবে না' বলে ঘোষণা দেন এবং আন্দোলনকারীদের মোকাবিলা করতে ছাত্রলীগ ও অন্যান্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন। আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা ও একজন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এই সহিংসতার পক্ষে অবস্থান নেন। এ ছাড়া আরও তিনজন মন্ত্রী প্রকাশ্যে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের 'দেশদ্রোহী' ও 'রাজাকার' আখ্যা দিয়ে তাদের দমন করার আহ্বান জানান।

BANGLA NEWS24.com

২৭৩. আন্দোলন অব্যাহত থাকায় আওয়ামী লীগের সশস্ত্র সমর্থকরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মিলে কিংবা তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালাতে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তারা এসব হামলার নেতৃত্ব দেন।

বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও আনসার/ভিডিপি

২৭৪. ১৬ জুলাই থেকে বাংলাদেশ পুলিশ শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের দমন করতে বলপ্রয়োগ করেছে, যেমন ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর অকারণে সহিংস দমন অভিযান চালানো হয়েছে।

২৭৫. আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার এবং সহিংস হয়ে ওঠার অনেক আগেই সরকার র‍্যাব, বিজিবি এবং আনসার-ভিডিপি'র সশস্ত্র সদস্যদের মোতায়েন করেছিল, যা সরকারের সর্বোচ্চ বল প্রয়োগের মাধ্যমে সামরিক এবং প্রাণঘাতী জবাবের প্রস্তুতি হিসেবে প্রতীয়মান হয়। ঢাকা ও অন্যান্য শহর অচল করে দেওয়ার আন্দোলনকে দমন করতে সরকার পুরোপুরি সামরিক কৌশলে চলে যায়। আন্দোলনকারীদের ভয় দেখাতে আকাশ থেকে হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়, আর রাজপথে পুলিশ ও র‍্যাব আন্দোলনকারীদের ওপর সামরিক রাইফেল ও শটগান থেকে গুলি চালায়। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দোলনকারীরা শুধু রাস্তা অবরোধ করছিলেন, কিন্তু তারা হত্যার বা গুরুতর আহত করার আসন্ন কোনো হুমকি সৃষ্টি করেননি। অনেক আন্দোলনকারী আত্মরক্ষায় বাধ্য হন।

২৭৬. কিছু ক্ষেত্রে জনতার কিছু অংশ সরকারি স্থাপনা, পরিবহন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে লক্ষ্য করে সহিংসতা চালায়। এর জবাবে সরকার নির্বিচারভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে, যা ছিল মাত্রাতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত। ১৮ জুলাই আন্দোলনকারীদের হামলায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ভবন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হলে, নিরাপত্তা বাহিনীকে 'সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহারের' নির্দেশ দেওয়া হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৯ জুলাই ও তার পরবর্তী সময়ে বিজিবি, পুলিশ ও র‍্যাব শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ও সহিংস বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে ব্যাপকভাবে গুলি চালাতে থাকে।

২৭৭. কিছু ক্ষেত্রে, পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে শিশুসহ ভুক্তভোগীদের খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা বা পঙ্গু করে ফেলে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

২৭৮. স্পষ্ট হত্যার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা অন্তত তিনটি ঘটনায় বিক্ষোভকারীদের ওপর সামরিক রাইফেল থেকে প্রাণঘাতী গুলি ছোড়ে, যেখানে অন্তত একজন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হন। সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলিও প্রাণঘাতী গোলাবারুদ ভর্তি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে শূন্যে গুলি চালিয়েছে, যা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং সম্ভবত এতে আরও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তবে ওএইচসিএইচআর যত সংখ্যক বেআইনি বলপ্রয়োগের ঘটনা শনাক্ত করেছে, সেখানে অন্যান্য বাহিনীর তুলনায় সেনাবাহিনীর হাতে ঘটা বেআইনি বলপ্রয়োগের ঘটনার সংখ্যা কম। এর পেছনে একটি কারণ ছিল সেনাবাহিনীর মাঠ পর্যায়ে থাকা অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান অনীহা। জুনিয়র কর্মকর্তারা ৩ আগস্টের সেনা বৈঠকে সেনাপতিকে সরাসরি জানান যে, তারা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাতে চান না।

বিশেষ করে অবরুদ্ধ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নৃশংস অপসারণের সময়, যেখানে পুলিশ ও র‍্যাব যাত্রাবাড়ী এবং এর আশেপাশে অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল।

২৭৯. তবে, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর গুরুতর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী তখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অবরোধ তুলে দেওয়ার সময়, যখন পুলিশ ও র‍্যাব যাত্রাবাড়ী এলাকায় বহু বিচারবহির্ভূত হত্যা চালায়, তখন সেনাবাহিনী তাদের সুরক্ষা দেয়, যাতে তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণের শিকার না হয়। সেনাবাহিনী এই অভিযানের পরিকল্পনায় সরাসরি যুক্ত ছিল, সেখানে সেনা মোতায়েন করে এবং সেনাপ্রধান নিজেই যাত্রাবাড়ী পরিদর্শন করে নিশ্চিত করেন যে অভিযান সম্পন্ন হয়েছে। জুলাইয়ের শেষ দিকে, সেনাবাহিনী কৌশলগতভাবে পুলিশের অভিযানকে সহায়তা করে। তারা এলাকায় নিরাপত্তার বেষ্টনী তৈরি করে এবং পুলিশ ও র‍্যাবের জন্য প্রস্তুত বাহিনী সরবরাহ করে, যাতে গণবিক্ষোভ আবার ছড়িয়ে না পড়ে। এ সময় পুলিশের অভিযানে নির্বিচারে বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৪ আগস্ট সেনাপ্রধান

BANGLA NEWS 24 .com

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলে একটি পরিকল্পনা তৈরি ও অনুমোদন করেন, যেখানে ৫ আগস্ট 'মার্চ অন ঢাকা' প্রতিরোধ করতে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। তবে, শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও বিজিবি এই পরিকল্পনার বড় অংশ বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে, যা তাদের একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত ছিল। সেনাবাহিনী সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়ার, একটি অন্তর্বর্তীকালীন

সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং তাৎক্ষণিক একটি অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতার প্রক্রিয়ায় পৌঁছানোর পথ সুগম করে।

গোয়েন্দা সংস্থা ও বিশেষায়িত পুলিশ শাখা

২৮০. গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই, এনটিএমসি এবং সশস্ত্র বাহিনীর ডিজিএফআই, পুলিশের বিশেষ শাখা–গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), বিশেষ শাখা (এসবি) এবং সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ ইউনিট (সিটিটিসি) প্রতিবাদ আন্দোলনের সহিংস দমনকে সমর্থন দিয়ে নিজেরা ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত হয়েছিল। জুলাইয়ের শেষ দিকে পরিচালিত নির্বিচার গণগ্রেপ্তার অভিযানের জন্য তারা সবাই আন্দোলনকারীদের ব্যাপারে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে, যার মধ্যে এনটিএমসির বেআইনি নজরদারির মাধ্যমে সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্যও ছিল। ডিজিএফআই, এনএসআই এবং গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) আহত আন্দোলনকারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য হাসপাতালে মোতায়েন হয়ে আহতদের গ্রেপ্তার করে এবং চিকিৎসকদের ভয় দেখিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা তার মিন্টো রোড সদর দপ্তরে নির্বিচারে অবৈধ আটক, নির্যাতন এবং অন্যান্য ধরনের দুর্ব্যবহার করে শিশুসহ আটককৃতদের কাছ থেকে তথ্য এবং স্বীকারোক্তি আদায় করে। শিশুদেরসহ সকলকে নির্বিচারে আটক রাখার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করেছিল সিটিটিসি। গোয়েন্দা শাখা ও ডিজিএফআই ছাত্রনেতাদের অপহরণ ও নির্বিচারে আটকে রাখার সাথে জড়িত ছিল এবং নির্যাতন ও অন্যান্য অমানবিক আচরণের মাধ্যমে তাদের বিক্ষোভ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা চালায়।

BANGLANEWS24.com

২৮১. লঙ্ঘন গোপন করার সংগঠিত প্রচেষ্টায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এনটিএমসি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সঙ্গে মিলে কৌশলে সময়মতো এবং লক্ষ্য অনুযায়ী ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়। এগুলো গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলমান লঙ্ঘনের প্রকাশ রোধে কাজ করেছিল। ডিজিএফআই এবং এনএসআই, সেইসাথে তথ্য মন্ত্রণালয় ও র‍্যাব গণমাধ্যমগুলোকে গণবিক্ষোভ ও তাদের সহিংস দমন সম্পর্কে সম্পূর্ণ এবং সত্যভাবে প্রতিবেদন না করার জন্য চাপ দিয়েছিল। ডিজিএফআই পুলিশের সাথে যোগ দিয়ে ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার এবং আইনজীবীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল, যাতে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে চুপ থাকে।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব

২৮২. পুলিশ, আধা-সামরিক বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাসহ

আওয়ামী লীগের শাখাগুলোর সম্মিলিত ও পরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে গুরুতর লঙ্ঘন এবং নির্যাতন সংঘটিত হয়, যা তৎকালীন সরকার ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জ্ঞাতসারে, সমন্বয়ে এবং নির্দেশনায় পরিচালিত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে যৌক্তিকভাবে বলা যায় যে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরাসরি এই লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত ছিল।

২৮৩. তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়মিত 'কোর কমিটি' সভা পরিচালনা করতেন, যেখানে পুলিশের প্রধান, আধা-সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশ নিতেন। ২০ জুলাই থেকে এসব বৈঠকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন সিনিয়র প্রতিনিধিও যুক্ত হন। এই 'কোর কমিটি' বৈঠকে সামগ্রিক কৌশল, বাহিনীর মোতায়েন এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান নিয়ে আলোচনা করা হতো।

২৮৪. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমন্বয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও সরাসরি এই কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিল। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তিনটি গোয়েন্দা সংস্থার (ডিজিএফআই, এনএসআই এবং পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ) প্রধানদের কাছ থেকে প্রতিদিনের প্রতিবেদন পেতেন যাদের সরাসরি তার কাছে রিপোর্টিং লাইন ছিল। ২১ জুলাইয়ের এক প্রতিবেদনে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা হয়েছিল। আগস্টের শুরুতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও তাকে এই উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন। ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত অন্তত একটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ও তার কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টারা শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি ও ফোনে যোগাযোগ করে অভিযান তদারকি করতেন এবং নির্দেশনা দিতেন।

BANGLA NEWS24.com

২৮৫. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডারদের ব্যক্তিগতভাবে আইন লঙ্ঘন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে সরাসরি জানার সুযোগ ছিল। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এবং ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনারকে সাথে নিয়ে ২০ বা ২১ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে যান, যখন পুলিশ ও র‍্যাব ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ও যাত্রাবাড়ী থানার আশেপাশে অসংখ্য বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা করছিল। এ সময় ধারণ করা একটি যাচাইকৃত ভিডিওতে দেখা যায়, এক স্থানীয় পুলিশ কমান্ডার মন্ত্রী এবং দুই শীর্ষ পুলিশ কর্মকর্তাকে জানাচ্ছেন যে, পুলিশ বিক্ষোভকারীদের গুলি করে হত্যা করছে। অন্যদিকে, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার মিন্টো রোডের গোয়েন্দা শাখার কার্যালয় পরিদর্শন করেন, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ আটক কেন্দ্র ছিল এবং নির্বিচারে আটক ও নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও বেশ কয়েকটি হাসপাতালে গিয়ে ভুক্তভোগীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং জুলাইয়ের শেষের দিকে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকারদের পরিবারের সাথেও কথা বলেন।

২৮৬. ওএইচসিএইচআরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কয়েকজন সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দাবি করেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা বাহিনীকে বলপ্রয়োগ সীমিত রাখতে এবং আইনের মধ্যে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মাঠপর্যায়ের

বাহিনীগুলো তা লঙ্ঘন করে। তবে, এই দাবিগুলো কম বিশ্বাসযোগ্য। ঢাকাসহ সারা দেশে নিরাপত্তা বাহিনী একই ধরনের গুরুতর লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়েছে। বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী সমর্থকদের নিয়ে সমন্বিত অভিযান চালিয়েছে, যা দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে। ওএইচসিএইচআরের মতে, দেশের বিভিন্ন স্থানের সব নিরাপত্তা বাহিনী একইভাবে শীর্ষ নেতৃত্বের আদেশ এবং নির্দেশাবলী পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষা করবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। বরং, পূর্ববর্তী বছরগুলোতে সরকারের দমনের সময় প্রতিষ্ঠিত ধরন অনুসরণ করে আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে, যদিও ২০২৪ সালের জুলাই এবং আগস্টে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল নজিরবিহীন। সবচেয়ে গুরুতর লঙ্ঘনগুলোর বেশিরভাগই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে বিজিবি ও র‍্যাব এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর মতো অভিজাত, সুপ্রশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে।

২৮৭. যেসব গুরুতর লঙ্ঘন ঘটেছে তার কোনোটিরই প্রকৃত তদন্ত বা জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা হয়নি। শীর্ষ নেতারা মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি এবং সংঘটিত লঙ্ঘন সম্পর্কে একাধিক প্রতিবেদন পেয়েছিলেন। তারপরও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায় বিক্ষোভকারী এবং বিরোধী দলগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়ে লঙ্ঘন গোপন করার জন্য অন্যান্য কর্মকর্তাদের চেষ্টাকে সক্রিয়ভাবে জোরদার করেছিলেন।

২৮৮. ওএইচসিএইচআর-এর কাছে সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য রয়েছে, যেখানে দেখা যায়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব গুরুতর লঙ্ঘনের সাথে জড়িত অভিযানের সাথে সরাসরি আদেশ এবং নির্দেশনা দিয়েছিল। ১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত 'কোর কমিটির' বৈঠকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজিবিকে আন্দোলন দমনে আরও বেশি প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে বলেন। অন্যান্য 'কোর কমিটির' বৈঠকে তিনি শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বেআইনি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অবরোধ মুক্ত করার পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'কোর কমিটি' সভায় পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, সেনাবাহিনী, ডিজিএফআই এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ব্যাপকভাবে নির্বিচারে গ্রেপ্তার অভিযান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার মধ্যে ব্লক রেইডও ছিল। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ব্যাপক ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল এবং যা গুরুতর লঙ্ঘন আড়াল করতে, নির্বিচারে গ্রেপ্তারের সুবিধার্থে এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ আয়োজনে বাধা দেওয়ার জন্য করা হয়েছিল।

২৮৯. একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাক্ষ্য অনুসারে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন যখন ১৯ জুলাই এক বৈঠকে উপস্থিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তিনি "বিক্ষোভের মূল হোতা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের গ্রেপ্তার, হত্যা এবং তাদের মৃতদেহ লুকিয়ে রাখার" আদেশ দিলেন। অন্যান্য বৈঠকেও তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে আন্দোলনকারীদের সরাতে সহিংস পদ্ধতি নিয়ে সিনিয়র নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাক্ষ্য অনুসারে, গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও ডিজিএফআই-এর মাধ্যমে

BANGLA NEWS 24 .com

ছাত্রনেতাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং আটকের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি ছাত্রনেতাদের জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির ভিডিও প্রকাশ করে জনসংযোগ বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য গোয়েন্দা শাখার প্রধানকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন, যদিও ছাত্রদের নির্বিচারে আটক এবং জোরপূর্বক তদন্তের কোনো নির্দেশ তিনি দেননি। ৪ আগস্ট সকালে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন এবং সন্ধ্যায় তার বাসভবনে দ্বিতীয় বৈঠক করেন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নিরাপত্তা খাতের সবচেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা 'মার্চ টু ঢাকা' প্রতিহত করতে বল প্রয়োগের পরিকল্পনায় সম্মত হন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, পুলিশ এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায় এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

মানবতাবিরোধী অপরাধের অধিকতর ফৌজদারি তদন্ত প্রয়োজন

২৯০. ওএইচসিএইচআর যুক্তিসঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করে যে, বিক্ষোভকারীদের এবং অন্যান্য বেসামরিক নাগরিক যারা বিক্ষোভে যোগদান বা সমর্থন করার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও পদ্ধতিগত আক্রমণের অংশ হিসেবে মানবতাবিরোধী অপরাধ, যেমন হত্যা, নির্যাতন, কারাদণ্ড এবং অন্যান্য অমানবিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ক্ষমতায় থাকার জন্য এগুলো করা হয়েছে বিক্ষোভকে সহিংসভাবে দমন করার পূর্ববর্তী সরকারের নীতি অনুসরণ করে। ওএইচসিএইচআর যথেষ্ট ভিত্তির ওপর এই ঘটনাগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করেছে, যদিও সেগুলো আদালতে ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণের মান অপেক্ষা নিম্নমানের। যাই হোক, মানবতাবিরোধী অপরাধ, আন্তর্জাতিক যেকোনো হয়রানিমূলক অপরাধ এবং দেশীয় আইনের অধীনে গুরুতর অপরাধের অভিযোগের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত ঘটনাগুলোর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরও ফৌজদারি তদন্তের দাবি রাখে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধির ৭(১) অনুচ্ছেদ, বাংলাদেশ যার একটি পক্ষ, অনুযায়ী, কোনো অপরাধকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে হলে এটিকে কোনো বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাপক বা পদ্ধতিগত আক্রমণ হতে হবে এবং সেটিকে অপরাধীদের জ্ঞাতসারে আক্রমণের অংশ বা আক্রমণের উদ্দিষ্ট অংশ হতে হবে। "যেকোনো বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণ" বলতে এমন আচরণকে বোঝায়, যার মধ্যে একাধিক হত্যা, নির্যাতন বা রোম সংবিধির ৭ অনুচ্ছেদের অধীনে নিষিদ্ধ অন্যান্য কার্যকলাপ জড়িত, যখন এই ধরনের আক্রমণ কোনো রাষ্ট্রীয় বা সাংগঠনিক নীতির স্বার্থ হাসিলে সংঘটিত হয়। 'ব্যাপক' বলতে আক্রমণের বৃহদাকার প্রকৃতি এবং 'পদ্ধতিগত' বলতে সহিংসতার সংগঠিত প্রকৃতিকে বোঝাবে, বিচ্ছিন্ন ঘটনার সম্ভাব্যতাকে নয়।

২৯১. ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, কারাদণ্ড ও অন্যান্য অমানবিক কর্মকাণ্ডের মতো প্রাসঙ্গিক নিষিদ্ধ কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে বেসামরিক নাগরিকদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। এই গোষ্ঠীর মধ্যে আন্দোলনকারী, সম্ভাব্য আন্দোলনে যোগদানকারী ব্যক্তি, ছাত্র, বিরোধী দলীয় কর্মী, সাংবাদিক এবং অন্যরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমনকি শুধু তরুণ, বেকার বা নির্দিষ্ট শহরাঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার ভিত্তিতেও অনেককে সন্দেহভাজন হিসেবে

BANGLA NEWS 24 .com

আটক করা হয়।

২৯২. এই পরিস্থিতিতে দেখা যায়, সরকারি বাহিনী ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মাধ্যমে সংঘটিত বহু হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধির ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মানবতাবিরোধী অপরাধের আওতায় পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনী একেবারে কাছ থেকে নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের গুলি করে হত্যা করেছে, যা তাদের হত্যার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে, সেনাবাহিনীর রাইফেল ও স্বয়ংক্রিয় পিস্তল থেকে আন্দোলনকারীদের ওপর সরাসরি গুলি চালানো হয়, বিশেষ করে তাদের মাথা ও বুক লক্ষ্য করে।

এই প্রেক্ষাপটে মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দ্বারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হত্যাকাণ্ড রোম সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কিছু ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা বাহিনী নির্দোষ বিক্ষোভকারীদের খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করেছে, যা তাদের হত্যার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা বাহিনী সামরিক রাইফেল এবং স্বয়ংক্রিয় পিস্তল থেকে মারাত্মক গোলাবারুদ জনতার দিকে চালিয়েছিল, মাথা এবং ধড়ের অংশ লক্ষ্য করে অথবা তারা খুব কাছ থেকে প্রাণঘাতী ধাতব গুলি ভর্তি শটগান এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান লক্ষ্য করে চালিয়েছিল। সাধারণত একাধিক বন্দুকধারী দ্বারা একাধিক রাউন্ড গুলি করা হয়েছিল। এই ধরনের অস্ত্র চালানোর সময় সেনা ও পুলিশ সদস্যরা জানতেন যে, এটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিশানায় থাকা জনতার একটি অংশের মৃত্যু নিশ্চিত করবে। এই হত্যাকাণ্ডের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষার বা অন্যদের প্রতিরক্ষার যুক্তি খাটে না, কারণ নিহত ব্যক্তিরা হয় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী, সম্পত্তি ধ্বংসকারী অথবা দাঙ্গাকারী ছিলেন, যারা অন্যদের প্রাণনাশ বা গুরুতর আঘাত করার জন্য তাৎক্ষণিক হুমকি সৃষ্টি করেননি।

BANGLA NEWS 24 .com

২৯৩. নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকরা যারা বেআইনিভাবে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ছুড়েছিল অথবা যারা চাপাতি এবং অন্যান্য বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণ করেছিল, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অমানবিক কাজ করেছিল। ফলে হাজার হাজার মানুষ চরম দুর্ভোগ ও গুরুতর আঘাতর শিকার হয়েছে—যার মধ্যে ছিল অন্ধত্ব, জীবনের জন্য পঙ্গু, খুলির হাড় ভেঙে যাওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্যান্য গুরুতর আঘাত।

২৯৪. নিরাপত্তা বাহিনী আটক ব্যক্তিদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। বিভিন্ন পুলিশ হেফাজত, গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও ডিজিএফআই-এর বন্দিশিবিরে তীব্র মারধর, ইলেকট্রিক শক, মৃত্যুর হুমকি এবং বিভিন্ন ধরনের চরম শারীরিক-মানসিক নিপীড়ন চালানো হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল স্বীকারোক্তি আদায়, তথ্য সংগ্রহ এবং আটক ব্যক্তিদের আতঙ্কিত করা। কিছু ক্ষেত্রে, নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভস্থলে আটককৃতদের ওপর নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহার করেছে, যেমন প্রতিবাদ করা, দাঙ্গায় অংশ নেওয়া বা আহত বিক্ষোভকারীদের সাহায্য করার শাস্তি হিসেবে তাদের পায়ে গুলি করা হয়েছে।

২৯৫. শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং মতপ্রকাশের অধিকার চর্চা করার কারণে কর্তৃপক্ষ

কর্তৃক নির্বিচারে আটক হাজারো মানুষকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল অথবা আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নিয়ম লঙ্ঘন করে শারীরিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরোয়ানা ছাড়াই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে, রাস্তা থেকে গণগ্রেপ্তার চালিয়ে এবং বিনা কারণ দেখিয়েই মানুষকে আটক করা হয়। অনেক ভুক্তভোগীকে পরবর্তীতে অমানবিক পরিস্থিতিতে আটক রাখা হয়েছিল, বিচারকের সামনে আনা হয়নি বা যথেষ্ট বিলম্বের পরেও আটক রাখা হয়েছিল। প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে শিশুদেরও একসাথে আটক করা হয়েছিল এবং কিছু শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের আটক অবস্থায় নির্যাতন এবং দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল।

২৯৬. এসব কর্মকাণ্ড একটি সুশৃঙ্খল এবং ব্যাপক আক্রমণের অংশ ছিল, যেগুলো বৃহৎ পরিসরে সারা দেশে নির্দিষ্ট একটি ধরনে পরিচালিত হয়েছে এবং যেখানে বিভিন্ন নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত ছিল। এই দমন অভিযানে হেলিকপ্টার, সাঁজোয়া যানসহ বিস্তৃত সরকারি সম্পদ ব্যবহার করা হয়, কয়েক হাজার নিরাপত্তা ক্ষেত্র এবং গোয়েন্দা কর্মীদের সাহায্যে। বিক্ষোভের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ভৌগোলিকভাবে একটি স্পষ্ট দৃশ্যমান প্যাটার্নে ছড়িয়েছে। এই দমন-পীড়নের ধরন সরকারের আগের আন্দোলন দমন অভিযানের অনুরূপই ছিল।

BANGLA NEWS 24 .com

২৯৭. ওএইচসিএইচআর-এর বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও পদ্ধতিগত এ আক্রমণ সরকারি নীতি অনুসারে এবং তারই ধারাবাহিকতায় পরিচালিত হয়েছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা হিংসাত্মক ও বেআইনিভাবে বিক্ষোভ দমন এবং ক্ষমতায় থাকার উদ্দেশ্যে এই আক্রমণ চালিয়েছেন। গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বও সংঘটিত অপরাধ গোপন করতে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে, অন্য পক্ষকে দোষারোপ করে এবং গণমাধ্যম, ভুক্তভোগী, ভুক্তভোগী পরিবার এবং আইনজীবীদের ভয় দেখিয়ে।

২৯৮. কমান্ডাররা এবং পুলিশ, অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের অনেক পদস্থ কর্মকর্তারা জানতেন যে, তাদের আচরণ একটি ব্যাপক এবং নিয়মতান্ত্রিক আক্রমণের অংশ ছিল, যার লক্ষ্য ছিল বিক্ষোভ দমন করা এবং সরকারকে ক্ষমতায় রাখা। বিশেষ করে, যেহেতু অনেকেই ইতোমধ্যেই অতীতে বিক্ষোভ দমন করার জন্য একই ধরনের সহিংস অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে ২০১৮ সালের কোটা বিক্ষোভ এবং ২০২১-২০২৩ সময়কালের বিভিন্ন বিক্ষোভ। অধিকন্তু, অনেক সেনাবাহিনীর জুনিয়র অফিসার এবং সাধারণ সৈন্যরা গুলি চালানোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বদেশিদের বেআইনি হত্যা কেবল শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে সাহায্য করবে। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, অন্যান্য অনেক পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা তা জানার পরও স্পষ্টতই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; যেমন একজন পুলিশ কমান্ডার বলেছিলেন, তারা “সরকারকে রক্ষা করছিলেন”।

২. বিক্ষোভ আন্দোলন, অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ জনগণ

২৯৯. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছিল একই ছাতার নিচে পরিচালিত আন্দোলন, যা বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র শাখাসহ বিভিন্ন ধরনের ছাত্রকে একত্রিত করেছিল। ১৮ জুলাই থেকে পুরোপুরি অবরোধের মাধ্যমে প্রধান সড়ক ও পরিবহন ব্যবস্থার কৌশলগতভাবে এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য আন্দোলন সম্প্রসারণের ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন । বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী এই আহ্বানের প্রতিধ্বনি করে এবং তাদের বহু সমর্থকসহ সাধারণ জনগণের বড় একটি অংশ এই ডাকে সাড়া দেয়।

৩০০. তবে, অসহযোগের আহ্বানের বাইরে গিয়ে, ভিড়ের মধ্যে অনেকেই সহিংস কর্মকাণ্ড শুরু করে। উত্তেজিত জনতা শুধু ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা ভাঙচুরই করেনি, বরং কিছু লোক আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে বিবেচিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানেও হামলা চালিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ভবনের ভেতরে মানুষ রেখেই সেখানে আগুন দিয়েছে এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক ও পুলিশ সদস্যদের ওপর সহিংস হামলা চালিয়েছে, এমনকি কয়েকজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। বিশেষ করে, ৪ আগস্ট থেকে প্রতিশোধমূলক সহিংসতার ঘটনা বেড়ে যায়, যখন সাবেক সরকার ক্ষমতা হারাতে শুরু করে। অনেক জায়গায়, স্থানীয় জনগণ পুলিশ ও আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাদের দ্বারা ভোগান্তির শিকার হওয়ায় তাদের প্রতি ক্ষোভ ঝেড়ে দেয়। কিছু ক্ষেত্রে, বিক্ষোভের এবং তার পরবর্তী সময়ে সহিংসতার সাথে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক, সদস্য এবং স্থানীয় নেতারা জড়িত ছিলেন।

BANGLA NEWS 24 .com

বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব

৩০১. সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে, বিক্ষোভে সহিংসতার ঘটনা পরিকল্পিত এবং বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। তারা প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন স্থানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ স্থাপনা, সরকারি ভবন এবং পরিবহন অবকাঠামোতে হামলা চালানো হয়েছে। তবে ওএইচসিএইচআর এই দাবির সমর্থনে কোনো তথ্য পায়নি। বরং, এটা অনুমান করা যায় যে, দেশব্যাপী পুলিশ এবং পূর্ববর্তী সরকার দেশজুড়ে বিক্ষোভকারীদের ওপর পরিকল্পিতভাবে যে গুরুতর এবং সুপরিচিত লঙ্ঘন চালিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে জনতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং কারো নির্দেশনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুলিশ ও সরকারি স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। বিশেষ করে, যেসব এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে পুলিশের নিপীড়ন বেশি ছিল, যেমন যাত্রাবাড়ী, উত্তরা ও আশুলিয়া, সেখানে পুলিশকে লক্ষ্য করে প্রতিশোধমূলক হামলা তীব্র ছিল।

৩০২. ওএইচসিএইচআর যতটুকু নিশ্চিত হতে পেরেছে, বিএনপি বা জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিক্ষোভ চলাকালে প্রকাশ্যে সহিংসতার ডাক দেয়নি। তবে, ওএইচসিএইচআর বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বের এমন কোনো বক্তব্য খুঁজে পায়নি, যেখানে তারা তাদের সমর্থকদের সহিংসতা থেকে বিরত থাকতে এবং আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী, পুলিশ বা সরকারি স্থাপনার ওপর হামলা না চালানোর আহ্বান জানিয়েছে। বিক্ষোভের পর, বিএনপি সহিংসতা বন্ধের প্রকাশ্যে আহ্বান জানায় এবং ৪৪ জন নেতাকর্মীকে সহিংসতার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বহিষ্কার করার প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়।

৩০৩. বিক্ষোভ চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু, আহমদিয়া মুসলিম ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। তবে কিছু ধর্মীয় স্থাপনায় হামলা, গুরুতর শারীরিক আক্রমণ এবং অন্তত একটি হত্যার ঘটনাও ঘটে। অপরাধীরা প্রায়শই বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে একযোগে কাজ করেছিল। এর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিশোধ, ধর্মীয় ও জাতিগত বৈষম্য, ব্যক্তিগত বিরোধ নিষ্পত্তি এবং স্থানীয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। যদিও বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর কিছু সদস্য, সমর্থক এবং স্থানীয় নেতারা সংঘটিত কিছু নির্যাতনে অংশ নিয়েছিলেন, এ দুই দলের নেতৃত্ব এই সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে। ওএইচসিএইচআর এমন কোনো তথ্য খুঁজে পায়নি যা প্রমাণ করে যে, জাতীয় নেতৃত্ব পর্যায়ে এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন সংঘটিত হয়েছিল।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ

৩০৪. ওএইচসিএইচআর কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা খুঁজে পেয়েছে, যেখানে কিছু শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং সম্পদ ধ্বংস করেছে। তবে, সবচেয়ে গুরুতর প্রতিশোধমূলক সহিংসতায় জড়িতদের সম্পর্কে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারাবাহিক বর্ণনায় জানা যায় যে, তাদের পোশাক, বয়স এবং আপাত আর্থিক অবস্থা অন্যান্য স্থানে দেখা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভকারীদের থেকে ভিন্ন ছিল। সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই একই বক্তব্য দিয়েছেন।

BANGLA NEWS 24 .com

৩০৫. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-এর নেতারা সাধারণভাবে তাদের 'মার্চ অন ঢাকা'-এর গণ আহ্বানে, যেটা সরকার পতনের দিকে মোড় নিয়েছিল এবং বিক্ষোভ-পরবর্তী সময়ে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার ওপর জোর দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ৬ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-এর একজন বিশিষ্ট নেতা সব অগ্নিসংযোগ ও হামলা বন্ধের আহ্বান জানান, বিশেষ করে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

৩. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

৩০৬. ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। অস্থায়ীভাবে সেনা সদস্য এবং কিছু বিজিবি ও আনসার/ভিডিপি সদস্যদের পুলিশ স্টেশনে মোতায়েন করা হয়। বেশ কয়েক দিন পর, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পুলিশ কর্মকর্তাদের কাজে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়, যদিও পুলিশ বাহিনীর কার্যকারিতা তখনও ছিল দুর্বল এবং কর্তৃপক্ষ প্রতিশোধমূলক হামলা ও ব্যক্তি পর্যায়ের হয়রানির পুরোপুরি প্রতিরোধ করতে ছিল অক্ষম। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, তার মেয়াদের প্রথম দিনগুলিতে দেওয়া বিবৃতিতে জনগণকে সকল ধরনের সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান এবং রাজনৈতিক দলের সদস্যদের শান্ত থাকতে অনুরোধ করেন। তিনি বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের নিন্দা জানান এবং

হিন্দুসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান।

৩০৭. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য পূর্ববর্তী সরকারের ফৌজদারি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কাজ শুরু করে এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার অভিযোগে ১০০ জনকে গ্রেপ্তারের কথা জানায়। তবে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগের মধ্যে বিদ্যমান কাঠামোগত ত্রুটিগুলো এই প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। যার মধ্যে রয়েছে, সুনির্দিষ্ট তদন্তের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করার একটি বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা তৈরির পরিবর্তে গণহারে মামলার ভিত্তিতে অপমানিত অভিযোগ দায়ের এবং গ্রেপ্তারের অপব্যবহার। গুরুতর সহিংসতার ফৌজদারি বিচারের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া এবং ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সময় এবং যত্ন সহকারে বিচারের গুরুত্বের ওপর জোর দেয় ওএইচসিএইচআর। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা প্রকৃত বা অনুভূত কোনো প্রকার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বা অন্যান্য বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, নিরপেক্ষ, ন্যায্য, অ-নির্বাচনীমূলক এবং প্রাপ্ত প্রমাণের শক্তির ভিত্তিতে হতে হবে। বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক সহিংসতা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিচারও বাদ দেওয়া যাবে না।

৩০৮. শুধু একটি বিস্তৃত ও সামগ্রিক জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাই পারে কয়েক দশক ধরে চলমান দোষীদের দায়মুক্তি ও প্রতিশোধের চক্র ভাঙতে, জাতীয় পুনর্গঠন ও নিরাময়ের জন্য ভিত্তি গড়ে তুলতে এবং বিচার ও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করতে, যেগুলো এতদিন কেবল ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ রক্ষার মাধ্যম হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। এই ধরনের একটি ব্যাপক পদ্ধতি অবশ্যই সমাজের সর্বত্র প্রকৃত, অন্তর্ভুক্তিমূলক পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতে হবে, যা একদিকে ভুক্তভোগী, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে এবং অন্যদিকে সরকার, প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপকে সহজতর করবে এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঐতিহ্যগত ক্ষোভগুলো শোনার ও যথাযথভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করবে। এই প্রক্রিয়া জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক সংহতির ও রূপান্তরমূলক নিরাময়ের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে।

IX. মূল কারণগুলো সমাধান করে দমন-পীড়নের পুনরাবৃত্তি রোধ

৩০৯. ২০২৪ সালের প্রতিবাদগুলো ব্যতিক্রমী কারণ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং শাসক দলের সহিংস সমর্থকদের দ্বারা নজিরবিহীন সংখ্যক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ গুরুতর নির্যাতন ও লঙ্ঘনের মুখেও আন্দোলনকারীদের জয় হয়। তবে, এগুলি পূর্ববর্তী বহু বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত দমন ও বর্জনের একটি ধরন। আগের বেশ কয়েকটি ঘটনায় পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী, সশস্ত্র ও সহিংস আওয়ামী লীগ সমর্থকদের সাথে নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, কম প্রাণঘাতী অস্ত্র, গণহারে নির্বিচারে গ্রেপ্তার, নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার, সাধারণ নজরদারি, হয়রানি এবং ভয় দেখানোর একটি সমাহার ঘটিয়ে বৃহৎ বিক্ষোভ দমন করেছে। এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হলো ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের বিক্ষোভের সময় সংঘটিত

BANGLA NEWS 24 .com

হত্যাকাণ্ড। ২০১৮ সালেও কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে ছাত্র বিক্ষোভ ছাত্রলীগ সমর্থকদের দ্বারা সহিংস আক্রমণ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, বেআইনি পুলিশ শক্তি প্রয়োগ এবং গণগ্রেপ্তার ও ভয় দেখানোর মাধ্যমে দমন করা হয়। ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে রাজনৈতিক বিরোধী দল, সুশীল সমাজ এবং পোশাকশ্রমিকদের আরও ধারাবাহিক বিক্ষোভও বেআইনি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গণহারে নির্বিচারে গ্রেপ্তার।

৩১০. নিরাপত্তা খাতের রাজনীতিকরণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সামরিকীকরণ, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তি এবং ভুক্তভোগীদের প্রতিকারের অভাবের কারণে এই লঙ্ঘনের ধরনগুলো সক্রিয় এবং তীব্রতর হয়েছে, যা নাগরিক ও রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন করার উদ্দেশ্যে প্রণীত দমনমূলক আইনের দ্বারা আরও সুসংহত হয়েছে। যদি এই সক্ষম কাঠামোগুলি ভেঙে মৌলিক সংস্কার করা না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যেকোনো স্বৈরাচারী সরকার, যে রাজনৈতিক মতাদর্শেরই হোক না কেন, নাগরিক ও রাজনৈতিক ভিন্নমত দমন এবং নতুন করে প্রতিবাদ করতে এগুলিকে পুনরায় সক্রিয় করার চেষ্টা করতে পারে।

৩১১. বৃহত্তর সংস্কার উদ্যোগের অংশ হিসেবে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন, গণমাধ্যম, নারী বিষয়ক নীতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসহ বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে। ২০২৪ সালের জুলাই এবং আগস্ট মাসে সংঘটিত লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে এই কমিশনগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হতে পারে, যদি তারা মানবাধিকার-ভিত্তিক সংস্কারগুলোকে সমর্থন করে এবং তা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার উভয়ের দ্বারা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়।

BANGLA NEWS 24.com

১. বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের সুযোগ রাখা পুরনো আইন

৩১২. বাংলাদেশে ব্যাপক বিক্ষোভের মাধ্যমে গণঅসন্তোষ প্রকাশের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে গত সরকারের আমলেও দেখা গেছে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভও অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের শিকার হয়েছে। এর একটি মূল কারণ হলো আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে পুলিশকে জনগণের নিরাপত্তা ও মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য নয়, বরং নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন, যা ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত হয় এবং এই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করে, তা পরিবর্তনের উদ্যোগ বহু আগেই স্থগিত হয়ে যায়। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি আধুনিক পুলিশ অধ্যাদেশ খসড়া করা হলেও পরের বছর আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর এটি পরিত্যক্ত হয়।

৩১৩. পুলিশের কর্মপন্থাসমূহ অনেকাংশেই ১৯৪৩ সালের বেঙ্গল পুলিশ বিধিমালার (পুলিশ রেগুলেশন্স অব বেঙ্গল) ভিত্তিতে রচিত, যা আরেকটি পুরনো ঔপনিবেশিক আইন। আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি এই বিধিমালা পুলিশকে

বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে এবং সম্পদ রক্ষায় প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং সেগুলো এমন কিছু পরিস্থিতিসমূহের কথা উল্লেখ করে, যেখানে পুলিশকে সরাসরি জনতার ওপর গুলি চালানোর প্রয়োজন হয়।

৩১৪. সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ওএইচসিএইচআর-কে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে নিরাপত্তা বাহিনী সম্পত্তি রক্ষার জন্যও প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগের অনুমতি পায়, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নিষিদ্ধ। তারা এটি যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির 'আত্মরক্ষা' বিষয়ক ধারা উল্লেখ করেছেন, যদিও এই বিধানগুলো মূলত শুধু জীবন বা গুরুতর আঘাতের হুমকির ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। যাই হোক না কেন, নিরপত্তারক্ষীদের মধ্যে আত্মরক্ষার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত আইনি বিধিবিধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দ্বারা বল ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের নির্দিষ্টতা এবং বিশেষ আইনি প্রয়োজনীয়তাগুলো যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে—যার মধ্যে জাতিসংঘের বল প্রযোগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মৌলিক নীতিমালা এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিধানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালা এবং মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের পুলিশ আইন হালনাগাদ করার জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর আরও জোর দেয়।

BANGLA NEWS24.com

২. নিরাপত্তা খাতের রাজনৈতিককরণ

৩১৫. একক রাজনৈতিক দলের পনেরো বছরের শাসনকালে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিকরণ ঘটেছে, যা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা খাতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অনেক পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়োগ ও পদোন্নতি পেশাদারিত্ব, সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং আওয়ামী লীগ ও সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য বা সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে, ডিজিএফআই, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই) এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চ মধ্যম ও উচ্চপর্যায়ের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের রাজনৈতিক দলীয় সম্পৃক্ততা এবং তাদের আত্মীয়দের রাজনৈতিক পরিচয় যাচাই করত। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) বা তার চেয়ে উচ্চপদে নিয়োগের অনুমোদন দিতেন। আওয়ামী লীগের অনুগত ব্যক্তিদের কৌশলগতভাবে মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটগুলো নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আলোচকরা তুলে ধরেন যে, রাজনৈতিক বিবেচনায় পুলিশে নিয়োগ প্রবণতা পূর্ববর্তী সরকারের আগে থেকেই ছিল এবং পুলিশ নিয়োগ ও পদোন্নতি পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন সংস্থার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে হচ্ছিল।

৩১৬. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ইতিহাস রয়েছে, যার মধ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ও অভ্যুত্থানের চেষ্টা অন্তর্ভুক্ত। যদিও সেনাবাহিনী তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বাহিনীর চেয়ে কম রাজনীতিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবুও কর্মরত সেনা কর্মকর্তারা এবং অন্যান্যরা যারা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জানেন, তারা ওএইচসিএইচআর-কে বলেছেন যে, সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে দলীয় রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে। রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ঢাকায় এবং সেনা সদর দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদোন্নতি বা নিয়োগ দেওয়া হতো, আর যারা 'অবিশ্বস্ত' বলে

বিবেচিত হতেন, তাদের পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করা হতো, দূরবর্তী এলাকায় বদলি করা হতো বা কিছু ক্ষেত্রে জোরপূর্বক সেনাবাহিনী ছাড়তে চাপ দেওয়া হতো। এটা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষে শুধু সেনাবাহিনী নয়, বরং সেনা কর্মকর্তাদের কমান্ডে থাকা আধাসামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, যারা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করতেন, এমন সংস্থাসমূহেরও অপব্যবহারের পথ সুগম করে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তি ও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বিচার ব্যবস্থা

৩১৭. ক্ষমতাসীন দল ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করেছে রাজনীতিকরণ। ক্ষমতাসীন দলের চ্যালেঞ্জসমূহ দমনের এবং দলীয় সদস্যদের অপরাধে হস্তক্ষেপ না করার বিনিময়ে পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী নিজেদের গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতির জন্য দায়মুক্তি পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারত।

৩১৮. যেখানে অপরাধের দায়মুক্তি একটি সাধারণ নিয়ম, সেখানে গুরুতর লঙ্ঘনে ফৌজদারি জবাবদিহিতা একটি অভাবনীয় ব্যতিক্রম। ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো ২,৫৯৭টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও ৭০৮টি গুমের ঘটনার অভিযোগ নথিভুক্ত করেছে। এ ছাড়া, শুধু র‍্যাবের বিরুদ্ধেই ৮০০টির বেশি হত্যাকাণ্ড ও প্রায় ২২০টি গুমের অভিযোগ উঠেছে। তবে, র‍্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শুধু একটি মামলায় হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, যেখানে নিহত ব্যক্তিদের একজন স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। একই সুশীল সমাজের সূত্র অনুযায়ী, ডিজিএফআই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৭০টির বেশি গুমের অভিযোগ থাকলেও, একজন ডিজিএফআই কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়নি।

৩১৯. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, জাতিসংঘের জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কমিটি আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা স্বীকারোক্তি আদায় বা ঘুষ আদায়ের জন্য ব্যাপক এবং নিয়মিত নির্যাতনের ঘটনার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিষিদ্ধকরণ) আইন' পাস করে। কিন্তু এরপরও অন্তত ১০৩ জন বন্দি নির্যাতনের ফলে মৃত্যুবরণ করেছেন। সরকার এই আইনের অধীনে মাত্র ২৪টি মামলা দায়েরের তথ্য দিয়েছে, যার মধ্যে শুধু একটিতে পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের হেফাজতে থাকা ব্যক্তিকে নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর ঘটনায় দায়েকৃত মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

৩২০. দায়মুক্তির এই ধরনগুলো এখন আইনি কাঠামোতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৩২ অনুযায়ী, সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হলে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন এবং কর্মকর্তারা যদি 'সৎ উদ্দেশ্যে' কাজ করেন, তবে তাদের জবাবদিহিতা থেকেও রক্ষা করা হয়। এই ধরনের বিধানগুলো অপরাধীদের পক্ষে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করে।

৩২১. বাংলাদেশে পুলিশ বাহিনীকেই নিজেদের অপরাধ তদন্ত করার দায়িত্ব

দেওয়া হয় এবং পুলিশের বিরুদ্ধে রিপোর্টকৃত লঙ্ঘনের মামলাগুলোর তদন্তভার শেষ পর্যন্ত এমন কর্মকর্তাদের হাতেই বর্তায়, যারা অভিযুক্ত অপরাধীর এখতিয়ারভুক্ত। অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে একটি পুলিশ ইন্টারনাল ওভারসাইট ইউনিট গঠন করা হয়। তবে, যখন কোনো মামলা এই ইউনিটের কাছে পাঠানো হয়, তখনও এটি যথাযথ সক্ষমতা ও স্বাধীনতার অভাবে ভোগে। এটি মূলত পুলিশ বাহিনীর নিম্ন-পদস্থ সদস্যদের ছোটখাট অসদাচরণের মামলাই পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ তদন্ত করার ক্ষমতা রাখে না।

৩২২. বাংলাদেশের নিয়মিত বিচার ব্যবস্থায় স্বাধীন ও পেশাদার প্রসিকিউশন সার্ভিস নেই, যা পুলিশি তদন্তের তদারকি ও দিকনির্দেশনা দিতে পারে। এর পরিবর্তে, পুলিশের তৈরি করা মামলাগুলো আদালতে উপস্থাপনের জন্য সুস্পষ্ট ও বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ড ছাড়াই আইনজীবীদের অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। বর্তমান প্রসিকিউশন ব্যবস্থা সরকারের জন্য রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে আইনজীবীদের লাভজনক মামলা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে এবং মনোনীত প্রসিকিউটরদের মাধ্যমে মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পথ খুলে দিয়েছে।

BANGLA NEWS 24 .com

৩২৩. সমগ্র বিচার বিভাগ তহবিলের অভাবে ভুগছে, যেখানে ৪২ লাখের বেশি মামলার জট রয়েছে, যার মধ্যে ২৪ লাখ ফৌজদারি মামলা। এটি দেখেছে সময়ের সাথে সাথে এর স্বাধীনতা হ্রাস। বিচার বিভাগের রাজনৈতিকীকরণ করা হয়েছে এবং এটা দুর্নীতি, রাজনৈতিক চাপ ও ভীতি প্রদর্শনের ঝুঁকিতেও রয়েছে বলে ব্যাপকভাবে বিবেচিত। আইন মন্ত্রণালয় বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতির বিষয়ে নেতৃত্ব দেয় এবং এই প্রক্রিয়ায় স্পষ্ট মানদণ্ড ও স্বচ্ছতা না থাকায় বিচারকদের ওপর এটা যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ২০১৬ সালে সংসদ এক সাংবিধানিক সংশোধনী পাস করে বিচারকদের সরাসরি অপসারণের ক্ষমতা নিজ হাতে নেয়, যা ২০২৪ সালের ২০ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে এবং সেই ক্ষমতা পুনরায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে ফিরিয়ে দেয়।

৩২৪. অন্যান্য তদারকি ব্যবস্থাগুলোও একই ধরনের স্বাধীনতার অভাব, ক্ষমতায়নহীনতা এবং রাজনীতিকরণের শিকার। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) প্যারিস নীতিমালায় প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের মানদণ্ডে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার মর্যাদার শর্ত পূরণে ব্যর্থ। পূর্ববর্তী সরকার এমন ব্যক্তিদের কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল, যারা স্বাধীন ছিলেন না এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর লঙ্ঘনের তদন্ত করার ক্ষমতা কমিশনের নিজেরই ছিল না।

৩২৫. অপরাধীদের দায়মুক্তির অর্থ হলো, গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিরা বিচার ও প্রতিকার হতে বঞ্চিত থাকা। যুগ যুগ ধরে চলমান অমীমাংসিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের একটি প্রধান পরিণতি হলো, তা ভুক্তভোগী ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের ন্যায্য ক্ষোভ ধামাচাপা পড়ে যাওয়ার ঘটনা পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি তৈরি করে, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক অবিশ্বাসকে চলমান রাখে, ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক গতিশীলতার ইন্ধন জোগায় এবং সামাজিক সংহতিকে ক্ষুন্ন করে।

৪. নাগরিক পরিসর সংকুচিতকরণ ও দমনমূলক আইনি কাঠামো

৩২৬. বিচার ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার করে সাবেক সরকার বাংলাদেশের প্রাণবন্ত নাগরিক সমাজকে দমন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ক্রমবর্ধমান দমনমূলক আইনি ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে নাগরিক সংগঠন, বিরোধী দলের কর্মী, সাংবাদিক, শ্রমিক সংগঠনের নেতা, আইনজীবী এবং ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করা ভুক্তভোগীদের ভয়ভীতি, হয়রানি, মিথ্যা মামলা এবং কিছু ক্ষেত্রে বেআইনি গ্রেপ্তার, গুম ও হত্যার শিকার হতে হয়েছে।

৩২৭. ২০১৬ সালের 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন' সরকারি কর্মকর্তাদের এনজিও এবং তাদের সদস্যদের কার্যক্রম তদারকি, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি অধীনে থাকা এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে এনজিওগুলোর নিবন্ধন বাতিল, বিদেশি তহবিল বন্ধ এবং প্রকল্প অনুমোদন বিলম্বিত করার মাধমে ভিন্নমত দমন করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। ফলে, সরকারের সমালোচনাকারী বহু মানবাধিকার সংগঠন তাদের কার্যক্রম বন্ধ বা থামিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

৩২৮. বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০৯ সালের সন্ত্রাস দমন আইন, ঔপনিবেশিক যুগের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩, দণ্ডবিধির মানহানির ধারাগুলো, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এবং এর পরিবর্তে প্রণীত সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩—এই সবকটি আইনে ব্যাপক ও অস্পষ্ট ফৌজদারি অপরাধের সংজ্ঞা রয়েছে। এগুলো সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী ও রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ভয় দেখানোর ও চুপ করে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যথাযথ বিচারিক তদারকি ছাড়াই গ্রেপ্তার, তল্লাশি, জব্দকরণ ও নজরদারির অতি বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই ফৌজদারি বিধানগুলির অনেকগুলোতে।

৩২৯. পূর্ববর্তী সরকার একটি ব্যাপক ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ এবং ভিডিও ক্যামেরা (সিসিটিভি) সংশ্লিষ্ট নজরদারি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল, যা সমাজের মধ্যে 'নজরদারিতে থাকার' একটি সাধারণ ভয় তৈরি করেছিল। নাগরিক ও রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের লক্ষ্যকরে গ্রেপ্তার ও গুমের নির্দেশনা দিতে এবং তাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর তথ্য সংগ্রহ করতে এই নজরদারি করা হতো। জাতীয় টেলিযোগাযোগ মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এই নজরদারি ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থান করে। এনটিএমসি ইসরায়েলি এবং অন্যান্য বিদেশি কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত অত্যাধুনিক নজরদারি সরঞ্জাম এবং সফটওয়্যার পরিচালনা করে। পুলিশ, ডিজিএফআই, এনএসআই, র‍্যাব এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী এনটিএমসি কাঠামোর সাথে একীভূত, যা তাদের নজরদারি তথ্যে ব্যাপক এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার দেয়। এনটিএমসি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনের অস্পষ্ট বিধানের ওপর ভিত্তি করে বিশাল নজরদারি ক্ষমতার দাবি করলেও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ডিজিটাল নজরদারি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

BANGLA NEWS 24 .com

৩৩০. সরকারের নির্দেশে ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্লক বা ইন্টারনেট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে জাতীয় টেলিযোগাযোগ মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনের (বিআরটিএ) একই বিধান প্রয়োগ করে। জুলাই ও আগস্ট ২০২৪-এর ইন্টারনেট বন্ধের ঘটনাগুলো ছিল বিশেষভাবে কঠোর, তবে এ ধরনের পদক্ষেপ নতুন কিছু নয়। ২০১২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সরকার নির্বাচনের সময়, বিক্ষোভ বা অস্থিরতার কারণে কমপক্ষে ১৭ বার ইন্টারনেট বন্ধ করেছিল বলে জানা গেছে।

৫. আইন ও বাস্তবে কাঠামোগত বৈষম্য

৩৩১. বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস এবং পরবর্তী সরকারগুলোর অনুসৃত সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী নীতির ফলে কাঠামোগত বৈষম্যের বিভিন্ন রূপ তৈরি হয়েছে। বৈষম্য নিষিদ্ধ করার বিধান থাকা সত্ত্বেও, ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয়তাবাদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু 'বাঙালি' পরিচয়কে জাতীয় পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অ-বাঙালি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোর অবস্থানকে প্রান্তিক করা হয়েছিল। ১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশকে পরবর্তী সংবিধান সংশোধনীতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যা ইসলামি পরিচয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

৩৩২. অধিকন্তু, গ্রামীণ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা ও সামাজিক সেবার সুযোগ সীমিত থাকায় তাদের সাক্ষরতার হার কম এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাব ছিল। স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় বৈষম্যমূলক অনুশীলনের ফলে এই পদ্ধতিগত বাধাগুলি আরও জটিল হয়ে ওঠে, যা প্রায়শই সম্পদ বণ্টন, আইন প্রয়োগ এবং বিচার ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পক্ষে ছিল। ফলে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো পরিকল্পিত সহিংসতার শিকার হওয়ার পাশাপাশি ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

৩৩৩. রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও, রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণকারী নারীরা সমাজের একটি অংশের দ্বারা এখনো লিঙ্গভিত্তিক বিভ্রান্তিমূলক ধারণা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। এটি বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিক্ষোভ দমনের সময়, যখন নারী শিক্ষার্থীসহ আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীরা যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার, বিশেষ করে যৌন হয়রানির শিকার হন। কিছু অপরাধী হয়তো এই কারণে উৎসাহিত হয়েছে যে, এই ধরনের সহিংসতা এবং হয়রানি সামাজিকভাবে এখনও প্রতিষ্ঠিত এবং জাতীয় আইনের অধীনে এখনও সম্পূর্ণরূপে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

X. সুপারিশসমূহ

৩৩৪. ওএইচসিএইচআরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অনেক প্রতিবাদকারী, যাদের মধ্যে অনেকে গুরুতর আহত, তারা জোর দিয়ে বলেন যে, দেশের প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায্য সুযোগের

BANGLA NEWS24.com

জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়বহতা এবং সমস্যার গভীর কারণ নির্মূলের জন্য প্রতিবাদমুখর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সংস্কার, যাতে এধরনের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয়। এই প্রক্রিয়ায়, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যারা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অপব্যবহারের শিকার, যা কেবল ২০২৪-এর সহিংসতার কারণে ঘটেনি, বরং দীর্ঘ সময় ধরে চলা রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে ঘটেছে। এসব ক্ষোভ প্রশমনে তাদের ক্ষোভ-দুঃখ-কষ্টগুলো শোনা দরকার। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে এসকল সমস্যা সমাধানে ন্যায়সঙ্গত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

৩৩৫. ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশপাশি নিরাপত্তা ও বিচার ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার জরুরি। নিপীড়নমূলক আইনগুলো বাতিল এবং প্রতিষ্ঠানগুলো এমনভাবে সাজান, যাতে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির নিরসন ও ভিন্নমতগুলো প্রকাশ করা যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করুন।

৩৩৬. ওএইচসিএইচআর অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচিত সরকারের কাছে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো তুলে ধরছে। এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত।

BANGLA NEWS 24.com

১. জবাবদিহিতা এবং বিচার বিভাগ

৩৩৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অন্যান্য অপব্যবহার, জোরপূর্বক গুম এবং যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার তদন্ত ও বিচারের জন্য কার্যকর, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং সমন্বিত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করুন; যার মধ্যে ২০২৪ সালের কোটা বিক্ষোভের পূর্ববর্তী মামলা এবং প্রতিশোধমূলক সহিংসতা সম্পর্কিত মামলাগুলো রয়েছে। যেসকল অপরাধী নির্দেশদাতা ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন তাদের বিদ্যমান আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে জবাবদিহি নিশ্চিত করুন। একই সঙ্গে, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কার্যকর প্রতিকার এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুন।

৩৩৮. অবিলম্বে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারি আদেশ এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ নথি এবং ফরেনসিক প্রমাণসহ প্রাসঙ্গিক প্রমাণগুলি সংকলন এবং সংরক্ষণ করুন এবং প্রমাণগুলি ধ্বংস বা লুকানোর চেষ্টাকারী কর্মকর্তাদের এবং অন্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সাক্ষী সুরক্ষার ওপর দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা আইন প্রণয়ন এবং জরুরি ভিত্তিতে ভিকটিম এবং সাক্ষী সুরক্ষা প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। নিরাপত্তা বাহিনীর স্বাধীনতা সুরক্ষা এবং সাক্ষীদের ভয় দেখানো প্রতিরোধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং ফৌজদারি তদন্তের উদ্যোগ নিন।

৩৩৯. ইস্যুভিত্তিক সাধারণ নির্দেশাবলি-আইনের স্থগিতাদেশ বাতিল। ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৩২ ধারা এবং অন্যান্য অনুরূপ আইনে যে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তা রহিতকরণ সাপেক্ষে সরকারি কর্মকর্তাদের তদন্ত এবং বিচারের জন্য

অনুমতি দিন।

৩৪০. বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত অপরাধগুলি নিয়মিত আদালতে বিচারের আওতায় আনা এবং স্পষ্ট করার জন্য আইনি কাঠামো সংস্কার করা, এমনকি যদি তা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বা সামরিক এখতিয়ারের অধীনস্থ অন্য কোনো কর্মীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়।

৩৪১. গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগে অভিযুক্ত নির্দেশ এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাময়িক বরখাস্ত করুন। যেসব অপরাধগুলোর তদন্ত ঝুলে আছে সেগুলোর সম্পূর্ণ, স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করুন এবং বিচারের আওতায় আনুন।

৩৪২. একটি ব্যাপক এবং সমন্বিত জাতীয় সংলাপ শুরু করুন, যাতে একটি কার্যকরী এবং প্রেক্ষিত অনুযায়ী ট্রানজিশনাল জাস্টিস মডেল তৈরি করা যায়। এই মডেলটি দায়ী অপরাধীদের বিচার, বিশেষ করে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধীদের জন্য একটি ভুক্তভোগী-কেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করবে। এর মাধ্যমে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব দূর করা হবে। এর উদ্দেশ্য হবে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ, সামাজিক ঐক্য তৈরি এবং জাতীয় নিরাময় নিশ্চিত করা, যেমন সত্য অনুসন্ধান, ক্ষতিপূরণ, স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি, নিরাপত্তা বাহিনীর পুনর্বিবেচনা এবং ভবিষ্যতে সংঘাতের প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়া।

BANGLA NEWS 24 .com

৩৪৩. ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দ সংগ্রহ করা, যাতে স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে তাদের দাবি মূল্যায়ন করা যায় এবং সঠিকভাবে ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা সেবা এবং অন্যান্য সহায়তা দেওয়া যায়।

৩৪৪. সততা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং যোগ্যতাসহ পেশাদার পূর্ণকালীন কর্মীদের দিয়ে একটি স্বাধীন পাবলিক প্রসিকিউশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করুন। রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা বা পূর্বধারণাসহ কোনো ধরনের পক্ষপাত ছাড়াই লোকবল নিয়োগ দিন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করুন। এটা নিশ্চিত করুন যে, পাবলিক প্রসিকিউটররা ভয়ভীতি, হয়রানি বা অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম।

৩৪৫. আইনে এবং বাস্তব প্রয়োগে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন, এবং তার জন্য এটা্ও এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন বিচারকদের নিয়োগ, বরখাস্ত, অপসারণ ও শৃঙ্খলাজনিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি সত্যিকারের স্বাধীন দায়িত্বশীল প্রক্রিয়া মাধ্যমে হয় । একই সঙ্গে, বিচারকদের ভয়ভীতি ও হয়রানি থেকে সুরক্ষা দিতে হবে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ ও দুর্নীতিসহ যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বা অন্যায্য হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে হবে এবং যথাযথ পারিশ্রমিক ও অবসরের পূর্বে বা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

মানবাধিকারসহ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ তৈরি করুন, যাতে ম্যাজিস্ট্রেটরা নিষ্ঠার সাথে এবং স্বাধীনভাবে তাদের তত্ত্বাবধানে চলমান কাজগুলি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, বিশেষত নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা গ্রেপ্তার, আটক এবং বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে।

৩৪৬. আইন প্রয়োগের কাজ, যেমন গ্রেপ্তার, অনুসন্ধান, জব্দকরণ এবং নজরদারি ব্যবস্থার ওপর সঠিকভাবে নজরদারি চালানোর জন্য বিচার বিভাগকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও জনবল সরবরাহ করুন। এই সেক্টরকে সরকার বা রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

৩৪৭. মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ স্থগিত করা হোক, যার মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালও থাকবে। মৃত্যুদণ্ডের বিধান পুরোপুরি বিলুপ্ত করার পাশাপাশি আইসিসিপিআর-এর দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রটোকলে যোগদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩৪৮. বলপূর্বক নিখোঁজ সংক্রান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো প্রকাশ এবং এ-সংক্রান্ত সুপারিশ ও ফলাফলগুলো দক্ষতার সঙ্গে পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য জাতীয় কমিশনকে সহায়তা এবং পর্যাপ্ত রিসোর্স সরবরাহ করুন। গোয়েন্দা, আধাসামরিক, পুলিশ বা সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত আটকের সমস্ত গোপন স্থান সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করুন এবং সেগুলো বন্ধ করুন। এই ধরনের জায়গায় সংঘটিত বলপূর্বক গুম, নির্যাতন এবং অন্যান্য অপরাধে যুক্ত চিহ্নিত অপরাধীদের তদন্ত ও বিচারের আওতায় আনুন।

BANGLA NEWS 24 .com

৩৪৯. বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সঙ্গে সম্পর্কিত বিচারিক প্রক্রিয়া, স্বচ্ছ বিচারের উদ্বেগ এবং মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে বিদ্যমান যে বিধান তা রহিতকরণে পদক্ষেপ নিন। ইতিমধ্যে, এর সঙ্গে পরিপূরক নীতিগুলো অনুসরণ করুন, রোম সংবিধির ১৪ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটরের কাছে এ প্রতিবেদনে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনার জন্য প্রেরণ করুন।

২. পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগ

৩৫০. আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিয়মাবলি এবং মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাংলাদেশের পুলিশ প্রবিধানগুলিকে সংশোধন করা প্রয়োজন। এ সংশোধনীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে বল প্রয়োগসহ, জনসমাগম ছত্রভঙ্গ করার জন্য ধাতব গুলি বা অন্যান্য প্রাণঘাতী গোলাবারুদ ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা, যা মৃত্যু বা গুরুতর হুমকির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেবে। অবিলম্বে জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসেবে শটগানের জন্য ধাতব শট গোলাবারুদ দিয়ে পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে সজ্জিত করার চর্চা বন্ধ করুন। সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীকে বর্মবিদ্ধ গোলাবারুদ দেওয়া সীমিত করুন। এগুলো সংস্কার করুন এবং পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করুন, সেখানে কীভাবে কম প্রাণঘাতী কৌশল এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করে বিক্ষুব্ধ জনগণ শান্ত করা এবং যোগাযোগমূলক পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া যা শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে সহজতর

করে এবং যেখানে প্রয়োজন হয় কম প্রাণঘাতী কৌশল, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ ব্যবহার করা।

৩৫১. গণহারে অভিযোগ এবং গণগ্রেপ্তার চর্চা বন্ধে পুলিশকে অবশ্যপালনীয় আদেশ জারি এবং প্রয়োগ করুন, বিশেষ করে যেগুলো ভিত্তিহিত এবং অতি প্রসস্থ সন্দেহভাজন তালিকার উপর ভিত্তি করে হয়। যেখানে আবশ্যক, মিথ্যা অভিযোগ বা নির্বিচারে গ্রেপ্তার রোধে শাস্তিমূলক এবং ফৌজদারি বিচার প্রতিষ্ঠা করুন।

৩৫২. নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিষেধাজ্ঞা) আইনের সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ জারি এবং প্রয়োগ করুন। একটি স্বাধীন নির্যাতন প্রতিরোধ এবং আটক পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালু করুন। নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল স্বাক্ষরের জন্য বিবেচনা করুন। পুলিশের তদন্ত পদ্ধতি, নির্দেশনা, নীতি ও প্রশিক্ষণে সংস্কার আনো যাতে ফরেনসিক বিশ্লেষণ, বলপ্রয়োগবিহীন জিজ্ঞাসাবাদ কৌশল এবং অন্যান্য এমন পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির ওপর নির্ভরতা কমায়।

BANGLA NEWS24.com

৩৫৩. ২০০৭ সালের খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশের ভিত্তিতে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন এবং মহানগর পুলিশের অধ্যাদেশগুলো বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন করুন, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতি ও মান অনুসারে জননিরাপত্তা ও জনগণের সুরক্ষায় পুলিশের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দেয়। এর পাশাপাশি, পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ, গুরুতর অসদাচরণের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ধাপে ধাপে জনগণের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৩৫৪. সুশীল সমাজসহ সরকার, বিরোধী দল এবং স্বাধীন সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠন করুন, যার নেতৃত্বে একটি ন্যায্য স্বচ্ছ ও যোগ্যতাভিত্তিক পুলিশ নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি এবং অপসারণ প্রক্রিয়া চালু করতে উদ্যোগ নিন।

৩৫৫. পুলিশ ওভারসাইট ইউনিটের পরিবর্তে একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠন করুন, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বাইরে থাকবে। এতে স্বাধীন সদস্যরা, বিশেষ করে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এটি জনসাধারণের অভিযোগ গ্রহণের জন্য বিশেষায়িত কর্মী, সক্ষমতা ও আইনগত ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। কমিশনটি পুলিশের যেকোনো সদস্য কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যান্য গুরুতর অসদাচরণের ব্যাপারে কার্যকর তদন্ত পরিচালনা করবে এবং মামলাগুলো বিচারের জন্য পাঠাবে। একইভাবে, সশস্ত্র বাহিনী ও বিজিবি সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত নির্যাতনের জন্য জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৩৫৬. র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে বিলুপ্ত করুন এবং গুরুতর লঙ্ঘনের সাথে জড়িত নয় এমন কর্মীদের স্ব স্ব ইউনিটে ফিরিয়ে দিন। বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশের (বিজিবি) কাজগুলিকে সীমানা নিয়ন্ত্রণের সমস্যা এবং ডিজিএফআইকে সামরিক

গোয়েন্দা তৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করুন এবং সেই অনুযায়ী তাদের সংস্থান এবং আইনি ক্ষমতা সীমায়িত করুন। আনসার/ভিডিপির ওপর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রোধ করুন এবং তাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সহায়ক হিসেবে কাজে লাগান।

৩৫৭. কেবলমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব এ সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ পাস করুন। আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং তাদের অনুমোদন সাপেক্ষে জনগণের কাছে তাদের নিয়োগ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে করা যেতে পারে।

৩৫৮. আন্তর্জাতিক এবং সুশীল সমাজের মতামতের ভিত্তিতে একটি ব্যাপকভিত্তিক স্বাধীন এবং ন্যায্য যাচাই অনুসরণের মাধ্যমে পুলিশ, গোয়েন্দা, বিজিবি, আনসার ভিডিপি এবং সশস্ত্র বাহিনীর যেসব কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের পদ থেকে অপসারণ করুন।

৩৫৯. একটি কার্যকর ও স্বাধীন মানবাধিকার যাচাই ব্যবস্থা চালু করুন, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক মিশনে কোনো বাংলাদেশি সদস্য মোতায়েন না হন, যদি তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানবিক আইন বা শরণার্থী আইনের লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ থাকে, অথবা তিনি যৌন নির্যাতন বা নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত থাকেন। যতদিন না এই ধরনের যাচাই ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে, ততদিন সরকারকে জাতিসংঘের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে যে, র‌্যাব, ডিজিএফআই, ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা বা ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনে অংশ নেওয়া বিজিবি ব্যাটালিয়নের কোনো সদস্যকে শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য মনোনীত করা হবে না।

৩. নাগরিক পরিসর

৩৬০. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেসব আইন বাতিল বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত, এমন সব ফৌজদারি আইনের অধীনে গ্রেপ্তার, তদন্ত বা মামলা দায়েরের ওপর তাৎক্ষণিক স্থগিতাদেশ দিন, যেগুলো স্বাধীন গণমাধ্যম, নাগরিক মতপ্রকাশ ও রাজনৈতিক ভিন্নমত দমনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩, সরকারি গোপনীয়তা আইন, সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং মানহানির অপরাধসংক্রান্ত দণ্ডবিধির ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া, এসব আইনসহ বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর আওতায় অতিরিক্ত গ্রেপ্তার, তল্লাশি, জব্দ ও নজরদারির ক্ষমতা সীমিত করুন এবং এসব কার্যক্রমের ওপর যথাযথ বিচারিক তদারকি নিশ্চিত করুন।

৩৬১. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন দ্বারা সুরক্ষিত আচরণের ক্ষেত্রে সাংবাদিক, আইনজীবী, ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, সুশীল সমাজ কর্মী এবং অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিচারাধীন ফৌজদারি মামলাগুলো প্রত্যাহার করুন।

৩৬২. এটা নিশ্চিত করুন যে সাংবাদিক, আওয়ামী লীগ সমর্থক, সংখ্যালঘু নেতা,

মানবাধিকার কর্মী এবং নাগরিক বা রাজনৈতিক ভিন্নমত প্রকাশকারী অন্যরা নির্বিচারে যেন গ্রেপ্তার, অপ্রমাণিত ফৌজদারি মামলা বা অন্যান্য ধরনের ভয়ভীতির শিকার না হন। প্রতিশোধমূলক সহিংসতার বিরুদ্ধে তাদের কার্যকর সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিন। এই ধরনের হামলার অপরাধীদের তদন্ত ও বিচার করুন, পাশাপাশি বেসরকারি সম্পত্তির ওপর হামলাসহ জনগণের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত দাবিগুলো বিবেচনায় নিন।

৩৬৩. অবিলম্বে নিরাপত্তা বাহিনীকে সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক নেতা, নাগরিক সমাজের কর্মী ও মানবাধিকার রক্ষকদের ওপর বেআইনি নজরদারি বন্ধের নির্দেশ দাও। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংস্থাগুলো নাগরিকদের ওপর যে নজরদারি চালিয়েছে, তার ওপর স্বাধীন জনতদন্ত শুরু করুন এবং এর প্রতিবেদন প্রকাশ করুন। ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার বাতিল করুন এবং নিশ্চিত করু যে, নিরাপত্তা সংস্থাগুলো নজরদারি চালানোর সময় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে চলে। টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনের অস্পষ্ট ধারাগুলো সংশোধন করুন, যা অনিয়ন্ত্রিত নজরদারির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩৬৪. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের আগে, ইন্টারনেট বন্ধের ওপর তাৎক্ষণিক স্থগিতাদেশ জারি করুন। নিশ্চিত করুন যে, ইন্টারনেট বন্ধ করা বা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট বা অ্যাপ ব্লক করার ক্ষেত্রে স্পষ্ট নিয়ম, স্বচ্ছতা এবং উপযুক্ত বিচারিক ও স্বাধীন তদারকি থাকবে। এটি শুধু বৈধ উদ্দেশ্যে এবং গণতান্ত্রিক সমাজে যতটুকু প্রয়োজন ও যুক্তিসঙ্গত, সেই মাত্রায়ই প্রয়োগ করা যাবে।

BANGLA NEWS 24 .com

৩৬৫. বিদেশি অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬ সংশোধন করুন, যাতে এটি আরও বিস্তৃতভাবে স্বাধীন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে সিভিল সোসাইটি ওরগাইজেশনগুলো বড় ধরনের বাধানিষেধ ছাড়া তহবিল সংগ্রহ এবং পরিচালনার করতে পারে।

৩৬৬. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ সংশোধন করুন, যাতে এটি প্যারিস নীতিমালার পূর্ণ অনুসরণ করে এবং স্বাধীনতা ও জনগণের আস্থা বাড়ে। নিশ্চিত করুন যে, কমিশনের সদস্যরা স্বাধীনভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক হয়, যেখানে নাগরিক সমাজসহ বাংলাদেশের সব সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য মতামত নেওয়া হয়। স্পষ্ট করুন যে, কমিশনের দায়িত্বের মধ্যে সেনাবাহিনী, পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করাও অন্তর্ভুক্ত। কমিশনকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও জনবল দিন, যাতে এটি কার্যকর, নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৪. রাজনৈতিক ব্যবস্থা

৩৬৭. মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা সাপেক্ষে অবাধ ও প্রকৃত নির্বাচনের জন্য একটি নিরাপদ এবং সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করুন। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ বিশেষত নির্বাচনের আগের যথোপযুক্ত

ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন। যেসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পরিবীক্ষণ করে তাদের সক্ষমতা বাড়ান, এতে শাসন কাজে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবে ভারসাম্য সমুন্নত হবে।

৩৬৮. নাগরিক এবং নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখতে যারা সরাসরি কাজ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যাদের অংশীদারত্ব আছে তাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ান। নাগরিককেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক কৌশলগুলো কাজে লাগান।

৩৬৯. মানবাধিকার নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা শুরু করুন।

৩৭০. রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা থেকে বিরত থাকুন; কারণ এ চর্চা প্রকৃত বহুদলীয় গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং কার্যত বাংলাদেশি ভোটারদের একটি বড় অংশকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

৩৭১. রাজনীতিতে ও জনপরিসরে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য আইন ও নীতিমালা কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করুন, যেখানে প্রয়োজন ও উপযুক্ত স্বল্পমেয়াদি বিশেষ ব্যবস্থা নিন।

BANGLA NEWS 24 .com

৫. অর্থনৈতিক সুশাসন

৩৭২. জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যমান আইন ব্যবহার করে ঋণ কেলেঙ্কারি ও অন্যান্য বড় ধরনের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ সম্পদ জব্দ ও ফ্রিজ করার ব্যবস্থা নিন। যদি এসব অবৈধ সম্পদ দেশের বাইরে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত এসব সম্পদ ফ্রিজ, জব্দ ও দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করুন। এই প্রক্রিয়াটি আইন মেনে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে, যাতে মানবাধিকার নিশ্চিত হয় এবং সম্ভব হলে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দেওয়া যায়। এছাড়া, বিদেশি কর্তৃপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা স্থানান্তরিত সম্পদের ওপর কঠোর নজরদারি বাড়াতে হবে।

৩৭৩. দুর্নীতি বিরোধী আইন কঠোরভাবে ও সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করুন এবং দুর্নীতিতে জড়িত সকল ব্যক্তিকে, বিশেষ করে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিন। দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা বাড়ান, যাতে এর সদস্যরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন এবং যথেষ্ট আইনগত ও প্রশাসনিক সহায়তা পান। সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ান, যাতে তারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে।

৩৭৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সঠিক প্রতিযোগিতা ক্ষতিগ্রস্ত করার এবং ভোক্তাদের প্রতি তাদের প্রভাব খাটানো কার্টেল ও অলিগোপলি বিরোধী জরুরি আইনগত ও নির্বাহী পদক্ষেপ নিন। বিশেষ কোনো বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে অবৈধ সুবিধা দেওয়া আইন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাতিল করুন এবং ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলোকে প্রচার করুন। অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণের ওপর জোর দিন, যাতে খাত-ভিত্তিক ঝুঁকি কমানো যায়, প্রবৃদ্ধি পুরো জনগণের উপকারে আসে এবং নতুন গ্র্যাজুয়েট ও বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একটি আরও ন্যায্য কর ব্যবস্থা প্রয়োগ করুন, যার মধ্যে সরাসরি কর, বিশেষ করে উচ্চ-আয়ের ব্যক্তিরা এবং বড় কোম্পানির জন্য আয় ও সম্পদ করের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং রাজনৈতিক পছন্দের কারণে দেওয়া ট্যাক্স ছাড়গুলো বাতিল করা হবে।

৩৭৫. শ্রমিকদের সুরক্ষা বাড়ান, যার মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের সমিতি গঠনের স্বাধীনতা রক্ষা, শ্রম পরিস্থিতি পরিদর্শন, কর্মপরিবেশের উন্নতি করা বিশেষত নারীদের জন্য, ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সংঘাতবিরোধী বৈষম্য, অন্যায় শ্রম অনুশীলন ও সহিংসতা মোকাবিলা করা।

BANGLA NEWS 24 .com

৩৭৬. ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দেয় যে, তারা জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের বিশেষ দলগুলোকে স্থায়ীভাবে আমন্ত্রণ জানাক, যাতে মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা যায়।

৩৭৭. এছাড়াও, ওএইচসিএইচআর সুপারিশ করে, যে সমস্ত লঙ্ঘন ও অপব্যবহার ঘটেছে, সেগুলোর ওপর আরও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক, বিশেষ করে প্রতিবাদের সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে, যাতে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায় এবং ভবিষ্যতে এসব লঙ্ঘন পুনরাবৃত্তি না হয়।

BANGLA NEWS 24.com

UNITED NATIONS
HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER